'বিজ্ঞান' (www.bigyan.org.in) –
এর কিছু বাছাই লেখার সংকলন

বিজ্ঞান পত্রিকা

নবম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১৭

জীবন বিজ্ঞান

জীবাণুদের যত কথা

ধাঁধা

ছোট্ট গাউস আর রেলগাড়ির অঙ্ক

পদার্থবিদ্যার কিছু বিস্ময়

গ্রাফিন-এ ডিরাক সমীকরণ: টেবিলের উপর
আপেক্ষিকতাবাদের পরীক্ষা

নবম সংখ্যা | সেপ্টেম্বর ২০১৭

www.bigyan.org.in-এর বাছাই করা লেখার সংকলন

‘বিজ্ঞান’ সম্বন্ধে জানতেঃ

ওয়েবসাইট - www.bigyan.org.in
ফেসবুকের পাতা - https://www.facebook.com/bigyan.org.in

ইমেইল - bigyan.org.in@gmail.com

সূচীপত্র

জীবাণুদের যত কথা ০৬
দেবনাথ ঘোষাল

ওরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র! খালি চোখে ওদের দেখা মেলা ভার। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখলে তবেই সেই ক্ষুদ্র প্রাণের চঞ্চলতা বোঝা যায়। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওদের উপস্থিতি আমরা টের পাই প্রতি মুহূর্তে! সেই জীবাণুদের কথা লিখছেন দেবনাথ ঘোষাল।

গ্রাফিন-এ ডিরাক সমীকরণ: টেবিলের উপর আপেক্ষিকতাবাদের পরীক্ষা ১৯
কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত

ব্রিটিশ পদার্থবিদ পল ডিরাক-এর তত্ত্ব এমন ইলেক্ট্রনদের ধর্ম ব্যাখ্যা করে যারা আলোর কাছাকাছি গতিবেগ নিয়ে চলে এবং বিশেষ আপেক্ষিতকতাবাদ-এর সূত্র মানে। কিন্তু এই তত্ত্বটিকে কি সাধারণ ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষা করে যাচাই করা সম্ভব? সেই গল্পই বলছেন কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত।

ধাঁধা: ছোট্ট গাউস আর রেলগাড়ির অঙ্ক ২৬
অর্ক ব্যানার্জ্জী

লোকাল ট্রেনে উঠে বইয়ের ফেরিওয়ালা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন যাত্রীদের কাছে। "দেখি এই প্রশ্নের উত্তর এখানে উপস্থিত কেউ দিতে পারেন কিনা!" এরকমই এক চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন এক মাস্টারমশাই তার ছাত্রদের কাছে। সেই ছাত্রবর্গের মধ্যে ছিলেন ইয়োহ্যান কার্ল ফ্রেইডরিচ্ গাউস। ধাঁধার ছলে শুনুন সেই গল্প অর্ক ব্যানার্জ্জীর কাছ থেকে।

সম্পাদকীয়

'বিজ্ঞান' পত্রিকার শুরু থেকে আমরা দেশে বিদেশে অনেক বিজ্ঞানপ্রেমীর কাছে উৎসাহ পেয়েছি। তার সাথে সাথে একটা প্রশ্নও এসেছে ঘুরেফিরে: "লেখা দিতে চাই। কি ধরণের লেখা আপনারা প্রকাশ করেন?" এই প্রশ্নটা নিয়েই একটু আলোচনা করতে চাই। প্রশ্নটা প্রত্যাশিত। আমরা বিভিন্ন স্বাদের, বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা প্রকাশ করেছি। কোনো বিষয়ে যেমন গভীর আলোচনা করেছি একদম স্কুলের ক্লাসরুম-এর মতো, তেমনই প্রকাশ করেছি বিজ্ঞানের টুকরো খবর। যেমন পদার্থবিদ্যা-রসায়ন-জীবনবিজ্ঞান-অঙ্ক বিজ্ঞানের এই প্রচলিত শাখাগুলোকে ছুঁয়ে গেছি, তেমনই বিজ্ঞানের ইতিহাস বা বিজ্ঞানীদের জীবনীও কিন্তু বাদ পড়েনি।

তাই লেখক হিসেবে মনে হতেই পারে: "এরা কোন বিজ্ঞানটা নিয়ে লেখে? আমি যে বিষয়টা নিয়ে লিখতে চাই, সেটা এই ওয়েবসাইটের উপযুক্ত তো? এই জাতীয় কোনো লেখা তো ওয়েবসাইটে আগে দেখিনি।" সম্প্রতি যেমন একজন 'মেশিন লার্নিং' নিয়ে এই ধন্দ প্রকাশ করেছিলেন। এর একটাই উত্তর দিতে পারি: আমরা ব্যাপক অর্থে 'বিজ্ঞান' শব্দটাকে দেখি। আপনার কাছে যদি কোনো বিষয়ে একটা গল্প থাকে, যার সাথে সামান্য হলেও বিজ্ঞানের যোগসাজশ আছে, আমরা আপনার লেখা পেতে আগ্রহী। সে মেশিন লার্নিং বা ক্রিপ্টোগ্রাফি নিয়েই হোক, কি গ্রিক দার্শনিকদের সময়কার বিজ্ঞানচর্চা, মানসিক রোগ নিয়েই হোক কি পরিবেশ দূষণ, কোনো বিষয়ই আমাদের কাছে অচ্ছুৎ নয়।

তাহলে সীমারেখাটা কোথায়? আমরা সম্পাদক হিসেবে কোনো লেখাকে যখন প্রকাশ করতে পারি না, তার কি কি কারণ থাকে? সেই ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে চাই, যাতে লেখক হিসেবে সংশয়গুলো কিছুটা দূর হয়। আশা করবো, এটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগ্রহী কলম ধরবেন এবং আপনার পরের লেখাটা আমরা শীঘ্রই পাবো।

বছর দুই আগে একটা সংবাদ মাধ্যমে আমাদের একজন সম্পাদকের ইন্টারভিউ নেওয়া হয়েছিল। তাতে একটা প্রশ্ন করা হয়েছিল, যেটা ভাষান্তরে বললে এরকম দাঁড়ায়: "আপনাদের দুএকটা লেখাতে দেখেছি উইকিপিডিয়া-কে একটা লেখার উৎস হিসেবে বলা হয়েছে। আপনারা কখনও উইকিপিডিয়া-র লেখাগুলোকে বাংলায় অনুবাদ করার কথা ভেবে দেখেছেন?"

এই প্রশ্নটার উত্তর দিতে গিয়েই আমাদের কোনো একটি লেখা প্রকাশ না করার প্রধান কারণটা বেরিয়ে আসে। পাঠককে কোনো বিষয়ের একটা সম্পূর্ণ ছবি দিতে হবে, এটা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তাই উইকিপিডিয়া-র বঙ্গানুবাদ আমরা করিনা। এবং একইভাবে সেই জাতীয় রচনাধর্মী লেখা যখন পাই, আমরা লেখককে অনুরোধ করতে বাধ্য হই লেখার ব্যাপ্তি কমিয়ে কোনো একটি অংশে আরো গভীরে যেতে। কিংবা যদি ব্যাপ্তি-টা রাখতেই চান, তাহলে অনেকগুলো অংশে ভেঙ্গে একটি সিরিজ লিখতে।

একটা উদাহরণ দিই। এটা নিছক কল্পনা, কোনো লেখক এরকম কিছু পাঠাননি। ধরুন আপনি পরিবেশ দূষণ নিয়ে লিখলেন। তাতে যদি আপনি ২০০০ শব্দের মধ্যে সবরকম পরিবেশ দূষণ নিয়ে লেখেন, ওজন স্তর-এ ফুটো থেকে শুরু করে গ্লোবাল ওয়ার্মিং, অ্যাসিড বৃষ্টি থেকে শুরু করে দিল্লি-র ধোঁয়াশা কমাতে অরবিন্দ কেজরিওয়াল-এর প্রচেষ্টা, কোনো একটি বিষয়ের উপর যথার্থ সময় দিতে পারবেন কি? এই জাতীয় লেখা পেলে আমাদের বলতেই হয়, যে কোনো একটি বিষয়ে লিখুন। নয়তো একটা সিরিজ লিখুন, যাতে অনেকগুলো লেখা থাকবে।

আমাদের শুধু এই একটাই অনুরোধ, আপনার লেখা থেকে যেন একটা স্পষ্ট এবং সুপাঠ্য গল্প বেরিয়ে আসে, যেন তোড়ায় বাঁধা নিরস তথ্যের ঝুড়ি মনে না হয়। কারণ আমরা চাই যাতে পাঠক লেখাটি আগ্রহের সাথে পড়ে। নিছক প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে নেবে লেখার মধ্যে, যেটা উইকিপিডিয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য, এটা আমাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য নয়। অবশ্যই যে কোনো ভালো ব্লগ লেখার হয়তো এই একটাই শর্ত থাকে। বিজ্ঞান যেহেতু খুবই তথ্যনির্ভর, তাই এই শর্তটা হয়তো আলাদা করে মনে করিয়ে দিতে প্রয়োজন: তথ্যের ভিড়ে মূল বক্তব্য যেন হারিয়ে না যায়।

এটা করতে খুব সুবিধে হবে যদি প্রথমেই এই প্রশ্নটা করেন: এই লেখাটা পড়ে পাঠক কি জানবে? কোন প্রশ্নটার উত্তর পাবে? এই প্রশ্নের উত্তর কি পাঠ্যবইয়ে ভালো করে দেওয়া থাকে? চাইলে, আপনার লেখার একটি সারাংশ দিয়ে শুরু করতে পারেন। আমরা লেখা প্রকাশ করার সময় লেখার শুরুতে একটা এক-দু লাইনের প্রশ্ন লিখি, চলচ্চিত্রের টিসার-এর মতো। আপনার লেখার টিসার-টা আপনিই লিখুন নাহয়। তাতে শুধু আমাদেরই সুবিধে হবে, তা কিন্তু নয়, আপনার বাকি লেখাটা হয়তো নিজে থেকেই বেরিয়ে আসবে।

জীবনীমূলক লেখাতে এই কাজটা করা বোধহয় সবথেকে জরুরি। একজন বিজ্ঞানীর সম্পূর্ণ জীবনকে তুলে ধরতে গেলে আবার সেই তথ্যের ফাঁদে পড়তে হয়। জন্ম-ছোটবেলা-সংগ্রাম-পুরষ্কারপ্রাপ্তি-বিবাহসন্তানাদি এইসবের মধ্যে একটা বিজ্ঞানীর কাজটা অনেকসময় হারিয়ে যায়। শুধু তার বৈজ্ঞানিক অবদান নয়, মানুষ হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, সেটাও অনেকসময় স্পষ্ট হয়না। তাই, জীবনীমূলক লেখার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে অনুরোধ, একটা সম্পূর্ণ জীবনকে তুলে ধরার চেষ্টা না করাই বোধহয় ভালো।

ব্যস, শুধু এইটুকু বলেই বিজ্ঞান পত্রিকার নবম সংখ্যা আপনাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। আমাদের লেখা দেওয়ার রীতিনীতি আরো বিশদে জানতে দেখুন http://bigyan.org.in/oldabout/tosubmitarticles। তবে সত্যি বলতে কি, নিয়ম একটাই: আপনার লেখাটির তথ্যগুলি যেন সঠিক হয় (যেমন, প্রয়োজনমতো রেফারেন্স যেন থাকে) এবং তার থেকে যেন একটি স্পষ্ট এবং মনোগ্রাহী গল্প বেরিয়ে আসে।

এবারের সংখ্যাতে আছে একটা ছোট ধাঁধা। ধাঁধাটি দুটো আলাদা চরিত্রকে একই সূত্রে জুড়ে দেয়: লোকাল ট্রেন-এর বই বিক্রেতা আর বিখ্যাত গণিতজ্ঞ কার্ল ফ্রেডরিক গাউস। তারপর আছে এক ঝলক পদার্থবিদ্যার ইতিহাস: গ্রাফিন-এ ডিরাক সমীকরণ। জানতে পারবেন, পদার্থবিদ্যার এক শাখায় তৈরী তত্ত্ব কিভাবে সম্পূর্ণ অন্য একটি শাখায় পুনরুজ্জীবিত হলো এবং পরীক্ষানিরীক্ষার আওতায় এলো। আর সবশেষে আছে একটি সিরিজ: জীবাণুদের যত কথা। লেখক যত্নসহকারে অতিক্ষুদ্র এই জীবাণুদের জগৎটাকে তুলে ধরেছেন। ব্যাকটেরিয়া কোষের গঠন থেকে শুরু করে লেখক দেখিয়েছেন সেই কোষে কিভাবে এন্টিবায়োটিক্স প্রভাব ফেলে। স্কুলের পাঠ্যবইয়ে এতো গভীরে এই আলোচনা পাওয়া যাবে না বলেই আমাদের ধারণা।

অবশেষে বলি, বিজ্ঞান পত্রিকা পড়ুন এবং পড়ান। এবং আপনার কাছে যদি বিজ্ঞান-সংক্রান্ত কোনো গল্প জমা থাকে, তাহলে সেই গল্পটা লিখে ফেলুন এবং আমাদের পাঠান।

সম্পাদকমণ্ডলী, 'বিজ্ঞান'
সেপ্টেম্বর ২০১৭

‘বিজ্ঞান’-এর সম্পাদনায় যারা আছি

- কুণাল চক্রবর্ত্তী (ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস, ব্যাঙ্গালোর)
- কাজী রাজীবুল ইসলাম (ইনস্টিটিউট ফর কোয়ান্টাম কম্প্যুটিং, ওয়াটার্লু বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)
- দিব্যজোতি ঘোষ (অ্যাডোবি, সান হোসে, ক্যালিফোর্ণিয়া, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় (ম্যাথওয়ার্কস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, সিনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শাওন চক্রবর্তী (হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শ্রীনন্দা ঘোষ (NGO পদক্ষেপ ও টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি ড্রেসডেন, জার্মানী)
- কাজী ফারহা ইয়াসমিন (আই বি এম, কলকাতা)
- আবির দাস (ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, লোয়েল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুমন্ত্র সরকার (ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সূর্যকান্ত শাসমল (ক্যাপজেমিনাই, কলকাতা)
- নীলাব্জ চ্যাটার্জী (ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, নরওয়ে)
- চিরঞ্জীব মুখার্জী (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- দীপ্যমান প্রামাণিক (হরিশচন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউট, এলাহাবাদ)
- ঝুমা সন্নিগ্রাহী (রাদারফোর্ড অ্যাপলটন ল্যাবরেটরি, ইউনাইটেড কিঙ্ডাম্)
- অমলেশ রায় (ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট ফর কোল রিসার্চ, জার্মানী)
- কৌশিক ব্যানার্জী (ইনটেল, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- সুদীপ্ত ব্যানার্জী (NGO পদক্ষেপ ও এমপ্লয়ী বেনিফিট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- শিলাদিত্য দেওয়াসি (NGO পদক্ষেপ ও কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)
- অমিয় মাজি (পারডিউ ইউনিভার্সিটি, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- অর্ণব রুদ্র, জুনিয়র (NGO পদক্ষেপ ও ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ডেভিস, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র)
- ধ্রুবজ্যোতি সিনহা (আই. এম. আর. বি. ইন্টারন্যাশনাল, ক্যান্টার গ্রুপ)

এবং সহযোগিতা করছেন বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা অসংখ্য বাঙালী বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান প্রেমী।

‘বিজ্ঞান পত্রিকা‘-র সম্পাদনা – শ্রীনন্দা, সূর্যকান্ত, নীলাব্জ, কুণাল, অর্ণব, অনির্বাণ, ধ্রুবজ্যোতি, ঝুমা ও রাজীবুল

প্রচ্ছদ ও পত্রিকার নকশা - সূর্যকান্ত

ইপাব পত্রিকা : নীলাব্জ

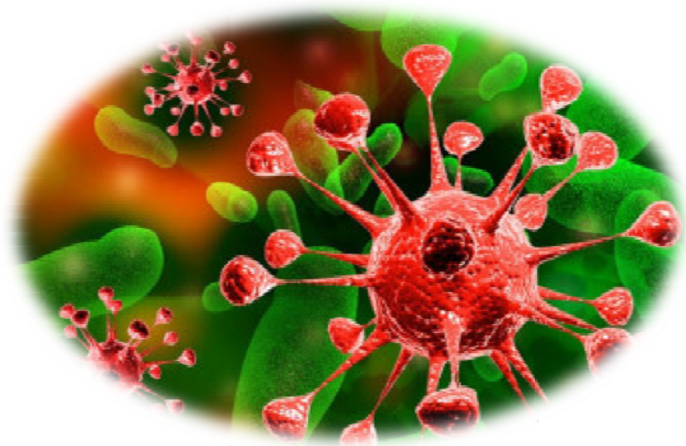

জীবাণুদের যত কথা

দেবনাথ ঘোষাল

|| সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ||

ওরা ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র! খালি চোখে ওদের দেখা মেলা ভার। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে রাখলে তবেই সেই ক্ষুদ্র প্রাণের চঞ্চলতা বোঝা যায়। আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ওদের উপস্থিতি আমরা টের পাই প্রতি মুহূর্তে ! দুধ থেকে দই তৈরী, ফল থেকে ওয়াইন, ময়দা থেকে কেক-বিস্কুট সবেতেই ওদের ব্যবহার। আবার উল্টোদিকে পৃথিবীর সব থেকে ভয়ংকর রোগ-ব্যাধির কারণও ওরাই। ঠিক ভেবেছ, আমি জীবাণুদের (microbes) কথা বলব।

জীবাণুদের মূলত চারটি ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে: ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, প্রোটোজোয়া আর ছত্রাক। ওদের সকলেরই আকার ভীষণ ছোট্ট: এক মিটার-এর দশলক্ষ ভাগ এর এক ভাগ বা তার থেকেও কম। কিছু ব্যতিক্রমী প্রোটোজোয়া আকারে সামান্য বড় হলেও কখনই তা ১ মিলিমিটার এর বেশী বড় হয় না। আকারে অতি ক্ষুদ্র হলেও জীবাণুরা সংখ্যায় কিন্তু মানুষ বা পৃথিবীর অন্যান্য সব প্রাণীর তুলনায় অকল্পনীয় ভাবে বেশী। একটু খুলে বলি তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে। পৃথিবীতে বর্তমানে মানুষের সংখ্যা আনুমানিক ৭,০০,০০,০০,০০০ (সাতশ কোটি, বা ৭ x ১০^{৯})। সম্প্রতি জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী পৃথিবীর মোট ব্যাকটেরিয়া-র সংখ্যা গণনা করতে বসে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। সেই সংখ্যা প্রায় ৫০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০, ০০,০০,০০০ (পাঁচশ কোটি কোটি কোটি কোটি, বা ৫ x ১০^{৩০}) । একই ভাবে ভাইরাস, প্রোটজোয়া আর ছত্রাক এর সংখ্যাও যে আমাদের তুলনায় অনেক অনেক বেশী সে কথা বলাই বাহুল্য।

ফিলিপস ভ্যান লীউবেন্‌হোক

লুই পাস্তুর

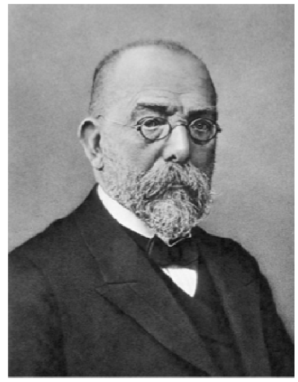

রবার্ট কক্

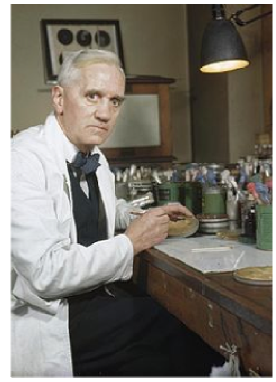

আলেকজান্ডার ফ্লেমিং

জীবাণুদের নিয়ে নানা গবেষণার ফলে একথা আজ সর্বজনবিদিত যে পৃথিবীর ইতিহাসে জীবাণুদের আবির্ভাব-ই সবার প্রথমে হয়েছে। সে আজ থেকে প্রায় ৩,৬০,০০,০০,০০০ বছর আগে। মানব সভ্যতার ইতিহাস সে তুলনায় অনেক নবীন। আধুনিক মানুষের ইতিহাস আনুমানিক ২,০০,০০০ বছর-এর। এই দীর্ঘ সময়কালে জীবাণুরা সবসময় মানুষের আশেপাশে থাকলেও ১৬৭৬ সালের ৯-ই অক্টোবর এর আগে ওদের কথা কেউ জানতই না। এই ছোট্ট ছোট্ট প্রাণগুলির সন্ধান প্রথম দেন ডাচ বিজ্ঞানী এন্টনি ফিলিপস ভ্যান লীউবেন্হোক (Antonie van Leeuwenhoek) । তাঁকে তাই জীবাণুবিজ্ঞান এর জনক বলা হয়ে থাকে। এই সময় অবশ্য এন্টনি ফিলিপস ভ্যান লীউবেন্হোক জানতেন না যে এই জীবাণুদের জন্যেই দুধ থেকে দই তৈরী হয়, খাদ্যে পচন ধরে, বা নগণ্য এই কণাগুলি প্লেগ, কলেরা বা যক্ষ্মা এর মত মারাত্মক রোগের কারণ। পরবর্তীকালে, প্রায় দুশো বছর পরে ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) ও জার্মান বিজ্ঞানী রবার্ট কক্ (Robert Koch) প্রথমবার জীবাণুদের মানুষের নানা রোগ এর কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেন। রবার্ট কক্ প্রমাণ করেন যে কলেরা ও টিউবারকিউলোসিস এর জন্যে দায়ী দুটি পৃথক জীবাণু। জীবাণু বিজ্ঞানে তাঁর অসামান্য অবদান এর জন্যে তাঁকে ১৯০৫ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়। রবার্ট কক্ এর সমসাময়িক ছিলেন লুই পাস্তুর ও ফার্দিনান্দ কহন (Ferdinand Julius Cohn)। জীবাণুবিজ্ঞানের রহস্য উন্মোচনে তাঁদের অবদানও অনস্বীকার্য। লুই পাস্তুর সর্বপ্রথম জীবাণু ঘটিত রোগ নিরাময়ে ভ্যাকসিন বা টীকা এর ধারণা দেন। তিনিই তরল পানীয় (দুধ, ওয়াইন ইত্যাদি) কে জীবাণুমুক্ত রাখার উপায় পাস্তুরায়ন (pasteurization) পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। আজও দৈনন্দিন জীবনে তরল পানীয় সংরক্ষণ করার জন্যে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে। জীবাণু বিজ্ঞানে আর এক সমসাময়িক আবিষ্কার হলো ব্যাকটেরিয়া প্রতিষেধক বা আন্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার। স্কটিশ বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার ফ্লেমিং (Alexander Fleming) ১৯২৯ সালে ব্রিটেন এর জার্নাল অফ এক্সপেরিমেন্টাল প্যাথলজি-তে সর্বপ্রথম আন্টিবায়োটিক-এর ধারণা প্রকাশ করেন। আন্টিবায়োটিক-এর আবিষ্কারকে জীবাণু বিজ্ঞান এর ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য মাইল ফলক হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

লীউবেন্হোক, লুই পাস্তুর, ফার্দিনান্দ কহন, রবার্ট কক্ বা আলেকজান্ডার ফ্লেমিং এর কথা সাধারণত আমরা নানা জায়গায় শুনে থাকলেও সে তুলনায়

উপেক্ষিত থেকে গিয়েছেন ডাচ বিজ্ঞানী মার্টিনাস বেয়েয়রিন্ক (Martinus Beijerinck)। ভাইরাস এর আবিষ্কার করে তিনি জীবাণু বিজ্ঞানে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। তাঁর এই আবিষ্কারের আগে জীবাণু বলতে কেবল মাত্র ব্যাকটেরিয়াকেই বোঝানো হত। ১৮৯৮ সালে তিনি প্রমাণ করেন যে তামাক গাছের (tobacco) সংক্রামক রোগের কারণ এক ক্ষুদ্র জীবাণু কিন্তু তার আকার ব্যাকটেরিয়ার থেকে বেশ কয়েক গুণ ছোট। নতুন আবিষ্কৃত এই জীবাণুদের তিনি নাম দেন ভাইরাস (Tobacco Mosaic Virus:TMV)।

সেই সময় তাঁর ধারণা ছিল ভাইরাস অনেকটা জেলির মত বা তরল জৈবকণা। তবে তৎকালীন অনুবীক্ষণ যন্ত্রে ভাইরাসদের দেখা কার্যত অসম্ভব ছিল। পরবর্তীকালে, ১৯৩১ সালে জার্মান বিজ্ঞানী নল ও রুস্কার (Max Knoll, Ernst Ruska) ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কারের পর ভাইরাসের গঠন সম্পর্কে আরো অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়। এক্সরে ক্রিস্টালোগ্রাফি আর ইলেক্ট্রন অণুবীক্ষণযন্ত্র এর নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা থেকে ১৯৪১ সালে প্রথম বোঝা যায় যে ভাইরাস আসলে নির্দিষ্ট গঠন যুক্ত কণা। ভাইরাস বিজ্ঞান বা ভাইরোলজি নিয়ে নানা গবেষণার থেকে অনুমান করা হয় যে পৃথিবীতে আনুমানিক দশ লক্ষাধিক রকমের ভাইরাস আছে। আগেই বলেছি পৃথিবীতে ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা আনুমানিক ৫ x $১০^{৩০}$, আর ভাইরাসের মোট সংখ্যা এর প্রায় দ্বিগুণ! একটা কথা মনে রাখা উচিত, যদিও ভাইরাসকে অনেক পাঠ্য পুস্তকে জীবাণু (জীব+অণু) বলে বর্ণনা করা হয়ে থাকে, প্রকৃত অর্থে ভাইরাস এর মধ্যে জীব-অণুর সমস্ত গুণ দেখা যায় না। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় ভাইরাসের কোনো কোষ বা অনুরূপ গঠন নেই। ভাইরাসের জৈব প্রক্রিয়ার (যথা বিভাজন) অস্তিত্ব কেবল মাত্র কোনো জীবিত কোষে সংক্রমণ এর পরেই দেখা যায়। অন্যথায়, প্রকৃতিতে ভাইরাস জড় পদার্থের মত দীর্ঘ সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে। সম্প্রতি ফ্রান্স এর একদল বিজ্ঞানী এক প্রকার নতুন ভাইরাস আবিষ্কার করেছেন যেগুলি গত দীর্ঘ ৩০,০০০ বছর ধরে সুপ্ত অবস্থায় সাইবেরিয়ার বরফের চাদরে ঢাকা ছিল কোনো জৈব প্রক্রিয়া ছাড়াই। কিন্তু আশ্চযর্জনকভাবে ল্যাবরেটরিতে এককোষী অ্যামিবার সংস্পর্শে আসতেই বোঝা যায় তারা এখনো বিভাজন প্রক্রিয়ায় সক্ষম ! তাই ভাইরাসকে সঠিক অর্থে জীবাণু না বলে, জীব ও জড়ের মধ্যবর্তী বস্তু বা জীবনের বাহক বলাই বেশী যুক্তিযুক্ত! ভাইরাস আর ব্যাকটেরিয়ার গঠনগত বৈশিষ্ট্য ও নানা জৈব প্রক্রিয়া সম্পর্কে পরবর্তী পর্বগুলোতে আমরা বিশদে আলোচনা করব।

ব্যাকটেরিয়া প্রধানত এককোষী (ব্যতিক্রম: সায়ানোব্যাকটেরিয়া) এবং ওদের কোষের মধ্যে

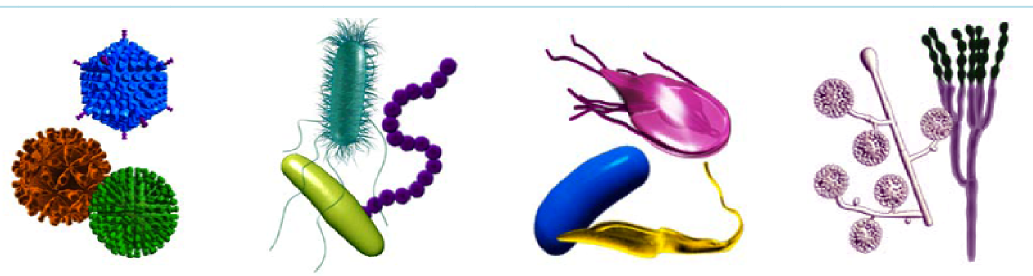

ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া প্রোটোজোয়া ছত্রাক

কখনই সংঘটিত নিউক্লিয়াস বা আবরণ পরিবেষ্টিত (membrane-bound) কোষীয় অঙ্গানু (organelle) থাকে না। ব্যাকটেরিয়াকে তাই প্রোক্যারিওট বলা হয়ে থাকে। ঠিক এখানেই প্রোটোজোয়া আর ছত্রাক জীবাণু হলেও ব্যাকটেরিয়ার থেকে আলাদা।

প্রোটোজোয়া প্রধানত এককোষী হলেও ছত্রাক এককোষী বা বহুকোষী হয়ে থাকে। উভয়ের ক্ষেত্রেই অবশ্য সংঘটিত নিউক্লিয়াস এবং আবরণ পরিবেষ্টিত (membrane-bound) কোষীয় অঙ্গাণুর (organelle) উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। প্রোটোজোয়া ও ছত্রাককে তাই ইউক্যারিওট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে। ইউক্যারিওটদের কোষীয় গঠন প্রোক্যারিওটদের থেকে অনেক উন্নত, তাই বুঝে নিতে অসুবিধে হয় না যে বিবর্তন এর ইতিহাসে প্রোক্যারিওটদের আবির্ভাব-ই আগে হয়েছে। বিবর্তন এর সময় সরণীতে ব্যাকটেরিয়ার (প্রোক্যারিওট) আবির্ভাব হয়েছিল আনুমানিক ৩,৬০০,০০০,০০০ বছর আগে এবং প্রোটোজোয়ার ও ছত্রাকের (ইউক্যারিওট) আবির্ভাব হয় তার অনেক পরে আনুমানিক ১,৫০০,০০০,০০০ বছর আগে। প্রোটোজোয়া ও ছত্রাক ইউক্যারিওট শ্রেণীভুক্ত; ওদের কোষের আভ্যন্তরীণ গঠন ও কোষীয় প্রক্রিয়া তাই অনেকটা উন্নততর ইউক্যারিওটদের (যেমন মানুষ: Homo sapiens) মতই হয়ে থাকে। ইউক্যারিওট কোষের নানাবিধ দিকগুলি আমাদের স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকে অনেক বিশদে আলোচনা করা হয় তাই সে বিষয়ে শেখার অনেক বেশী সুযোগ থাকে। সে তুলনায় প্রোক্যারিওট ও ভাইরাসদের বিষয়ে স্কুলের বই গুলিতে যে পরিমান তথ্য দেওয়া থাকে তা আশ্চর্যরকম ভাবে অপ্রতুল। শুধু তাই নয়, প্রদত্ত তথ্যের একাংশ সময়ের সাপেক্ষ্য অপ্রাসঙ্গিক এবং ভুল ! একটা ছোট্ট উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে। আমি স্কুল এর গন্ডি পেরিয়ে এসেছি সে প্রায় একদশকের বেশী সময় হলো। তখন ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা পড়েছিলাম "ব্যাকটেরিয়া হলো একটি উৎসেচক পূর্ণ ব্যাগ!"। গত এক দশকে গঙ্গায় কম জল বয়ে যায়নি! কয়েকমাস আগে হঠাৎ-ই একটা স্কুলের বই হাতে এসে পরেছিল। পাতা উল্টে অবাক হয়ে দেখলাম ব্যাকটেরিয়ার সংজ্ঞা কিন্তু পাল্টায়নি ! অথচ বিগত দুই দশকে নানা দেশের বিজ্ঞানীদের নিরলস গবেষণার ফলে আমরা আজ ব্যাকটেরিয়াদের সম্পর্কে অনেক বেশী জানি এবং তাদের কেবল মাত্র উৎসেচকপূর্ণ ব্যাগ বলে বর্ণনা করা নিশ্চিত ভাবে অবমূল্যায়ন !

নিজের মনে একটা প্রশ্ন করে দেখো, ব্যাকটেরিয়া যদি কেবল মাত্র উৎসেচকপূর্ণ একটা নিরীহ ব্যাগ হত তবে আজকের এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও কেন আমরা অতিশয় ক্ষুদ্র সেই ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণ থেকে নিজেদের রক্ষা করার উপায় বার করতে পারলাম না? এখনো প্রতিবছর কলেরা (Vibrio cholerae) আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৩০-৪০ লক্ষ (মৃত্যু লক্ষাধিক), টিউবারকিউলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৭০-৮০ লক্ষ (মৃত্যু দশ লক্ষাধিক) আর টিটেনাস (Clostridium tetani) আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ৫-১২ লক্ষ (মৃত্যু পঞ্চাশ হাজার এর বেশী)। শুধু এখানেই শেষ না, এর পরে নিউমোনিয়া, ডিপথেরিয়া, মেনিনজাইটিস, গনোরিয়া, ব্রংকাইটিস, যক্ষা, টাইফয়েড, প্লেগ আরো কত যে মারাত্মক রোগের কারণ ব্যাকটেরিয়া সে কথা বলে শেষ করা যাবে না! তাই একথা বলাই বাহুল্য যে ওদের সম্পর্কে আরো ভালো করে জানা এবং বোঝা বিশেষ প্রয়োজন! ব্যাকটেরিয়া ও

ভাইরাস এর গঠনগত বিষয়ে এখন চমরা কি কি জানি, ওদের সাথে আমাদের কোষের পার্থক্য কোথায়, কেনই বা ওদের বিরুদ্ধে যথার্থ প্রতিষেধক তৈরী করা যাচ্ছে না এছাড়াও নানা বিষয়ে আলোচনা করবো পরের অংশে।

|| ব্যাকটেরিয়ার গঠনগত বৈশিষ্ট্য ||

ব্যাকটেরিয়ার গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এবার একটু আলোচনা করা যাক। তোমরা ইতিমধ্যে জেনে গেছো যে ব্যাকটেরিয়া এককোষী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জৈবকণা। উন্নত জীবদেহ-ও তো অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমষ্টি । তাহলে এ প্রশ্ন মনে আসা স্বাভাবিক যে ব্যাকটেরিয়া কোষ এর সঙ্গে উন্নত জীবের কোষ এর কি কোনো পাথর্ক্য আছে? সঠিক উত্তর হল: হ্যাঁ। ব্যাকটেরিয়া আর উন্নত জীবকোষ এর মধ্যে আকারগত, গঠনগত এবং কার্যগত বিস্তর পার্থক্য দেখা যায়। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো ব্যাকটেরিয়ার বিচিত্র সব বাসস্থান। সাধারণ পরিবেশ ছাড়াও, উষ্ণপ্রস্রবণ এর ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায়, মহাসমুদ্রের ৮-১০ কিলোমিটার গভীরতায়, মেরুপ্রদেশের তুষার শীতলতায় বা অন্যান্য উন্নত জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ওদের অবাধ বিস্তার। আর তাই এই বিবিধ পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নেবার জন্যে ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক আচ্ছাদন অনেক জটিল এবং শক্তপোক্ত। এই শক্তপোক্ত বাহ্যিক আচ্ছাদন-এর জন্যই কোষরস বা cytoplasm এর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের অভিস্রবণজনিত চাপ (Turgor pressure) ব্যাকটেরিয়া সহজেই প্রশমিত করে ফেলে। যদিও সেই আচ্ছাদন এর মধ্যে দিয়ে কোষের পরিপোষক পদার্থ প্রবেশ করতে কোনো বাধা সৃষ্টি হয় না।

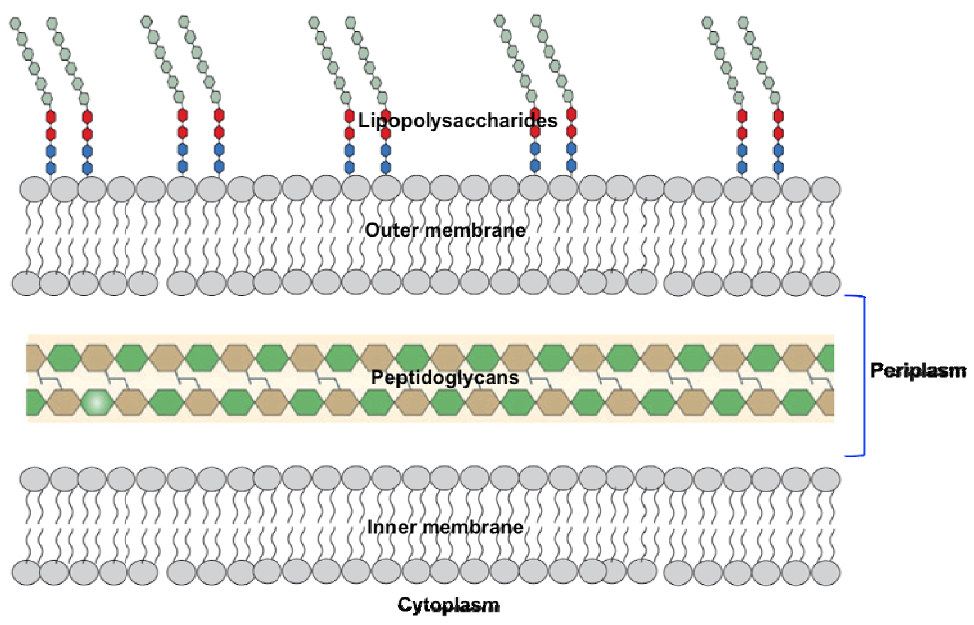

(ছবি: ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক আবরণ)

একথা বলাই বাহুল্য যে বাসস্থানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক গঠন নানাবিধ হয়ে থাকে। আজ থেকে প্রায় একশ ত্রিশ বছর আগে ১৮৮৪ সালে ডেনমার্কের বিজ্ঞানী হ্যানস ক্রিস্টিয়ান জোয়াকিম গ্রাম (Hans Christian Joachim Gram) ব্যাকটেরিয়াদের অণুবীক্ষণযন্ত্রের

নীচে আরো ভালো করে কি ভাবে দেখা যায় সেই নিয়ে গবেষণা করার সময় লক্ষ্য করেন কিছু ব্যাকটেরিয়া তাঁর ব্যবহিত রঞ্জক পদার্থে (Gram staining) সহজেই রঞ্জিত হচ্ছে এই সব ব্যাকটেরিয়াদের তিনি Gram-positive ও যে সমস্ত ব্যাকটেরিয়া সেই রঙে রঞ্জিত হয়না তাদের তিনি Gram-negative শ্রেণীভুক্ত করেন। আজও ব্যাকটেরিয়া শনাক্তকরণ ও শ্রেণীকরণ এর জন্যে Gram staining-এর বহুল ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে ঠিক কোন কারণে কিছু ব্যাকটেরিয়া Gram-positive এবং অন্যরা Gram-negative সে বিষয়ে ক্রিস্টিয়ান গ্রাম এর সঠিক ধারণা ছিল না।

পরবর্তীকালে, ইলেক্ট্রন অনুবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কারের পরে ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক গঠন সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্য জানা সম্ভব হয়। ব্যাকটেরিয়া কোষেরও কোষরস বা cytoplasm এর চারপাশে ঠিক আমাদের কোষের মতই কোষ-পর্দা (cell membrane) থাকে। এই কোষ-পর্দা মূলত দুটি ফসফো-লিপিড এর স্তর দিয়ে তৈরী। তবে এখানেই শেষ নয়। ব্যাকটেরিয়ার কোষ-পর্দার বাইরে আরো দুটি আবরণ থাকে! কোষরস পরিবেষ্টন করে থাকা কোষ-পর্দাকে বলা হয় অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা (inner membrane), কোষ-পর্দার পরের আবরণকে বলা হয় কোষ-প্রাচীর (cell wall) এবং সব শেষে আরো একটি কোষ-পর্দা থাকে একে বাহ্যিক কোষ-পর্দা (outer membrane) বলা হয়। অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা এবং বাহ্যিক কোষ-পর্দার মধ্যবর্তী স্থান হল পেরিপ্লাসম (periplasm)। বাহ্যিক কোষ-পর্দা অবশ্য কেবলমাত্র Gram-negative শ্রেণীভুক্ত ব্যাকটেরিয়াতেই দেখা যায়। Gram-negative ব্যাকটেরিয়াতে পেরিপ্লাসম এর আয়তন অনেক বেশী এবং তা মোট কোষের আয়তনের চল্লিশ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। Gram-positive ব্যাকটেরিয়াতে বাহ্যিক কোষ-পর্দা থাকে না তাই অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা আর কোষ-প্রাচীর এর মধ্যবর্তী সংক্ষিপ্ত স্থান-ই হল পেরিপ্লাসম । এখন প্রশ্ন হলো, পেরিপ্লাসমে থাকে কি? পেরিপ্লাসম কি cytoplasm এর মতই? উত্তরটা হ্যাঁ এবং না!

পেরিপ্লাসমের প্রধান উপাদান হল জলীয় তরল এবং প্রোটিন, অনেকটা কোষ-রস বা cytoplasm এর মতই। তবে পেরিপ্লাসমে প্রোটিন তৈরী হয় না কারণ সেখানে কোষ-রসের মত প্রোটিন তৈরী করার যন্ত্র অর্থাৎ রাইবোজোম থাকে না। অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দার মধ্যে দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রোটিন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদার্থ কোষ-রস থেকে পেরিপ্লাসমে রপ্তানি হয়ে থাকে। বাহ্যিক জগতের সঙ্গে ব্যাকটেরিয়া কোষের সমন্বয়-রক্ষা, চলা-ফেরা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি নানা কাজে পেরিপ্লাসমের ভূমিকা অপরিসীম।

আমাদের কোন কোষেই অবশ্য কোষ-প্রাচীর, পেরিপ্লাসম বা বাহ্যিক কোষ-পর্দার অস্তিত্ব দেখা যায় না। সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে আমাদের কোষের তুলনায় ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক প্রতিরক্ষা বলয় অনেক বেশি সংগঠিত!

|| ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক গঠন ||

আমরা ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক গঠন নিয়ে আলোচনা শুরু করেছি। আমাদের কোষের বাইরে কেবলমাত্র একটি কোষ-পর্দার আবরণ থাকলেও ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরে অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা, কোষ-প্রাচীর ও বাহ্যিক কোষ-পর্দা এই তিনটি স্তরের প্রতিরক্ষা বলয় কেন থাকে সে বিষয়েও আমরা স্বল্প-বিস্তর জেনেছি।

এবারে আমরা ব্যাকটেরিয়া কোষের বিভিন্ন বাহ্যিক আবরণের (অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা, কোষ-প্রাচীর ও বাহ্যিক কোষ-পর্দা) গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো ভালো করে জানব। ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষরস বা cytoplasm বেষ্টন করে যে আবরণ থাকে তাকে অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা বা inner membrane বলে। অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা দুটি ফসফো-লিপিড এর স্তর দিয়ে তৈরী এবং সাধারণত ৫-৮ ন্যানো মিটার (৫-৮ x $১০^{-৯}$ মিটার) পুরু একটি আস্তরণ। বলে রাখা ভালো যে কোষ-পর্দার প্রধান উপাদান ফসফো-লিপিড হলেও আরো দুই রকম এর লিপিড সেখানে পাওয়া যায়: গ্লায়কোলিপিড ও কোলেস্টেরল (যদিও কোলেস্টেরল ইউক্যারিওট কোষেই বেশী দেখা যায়)।

একটা প্রশ্ন মনে আসতেই পারে যে কোষ-পর্দায় লিপিড এর দুটি স্তর থাকে কেন? উত্তরটা লিপিড অণুর গঠন দেখলে সহজেই বোঝা যাবে।

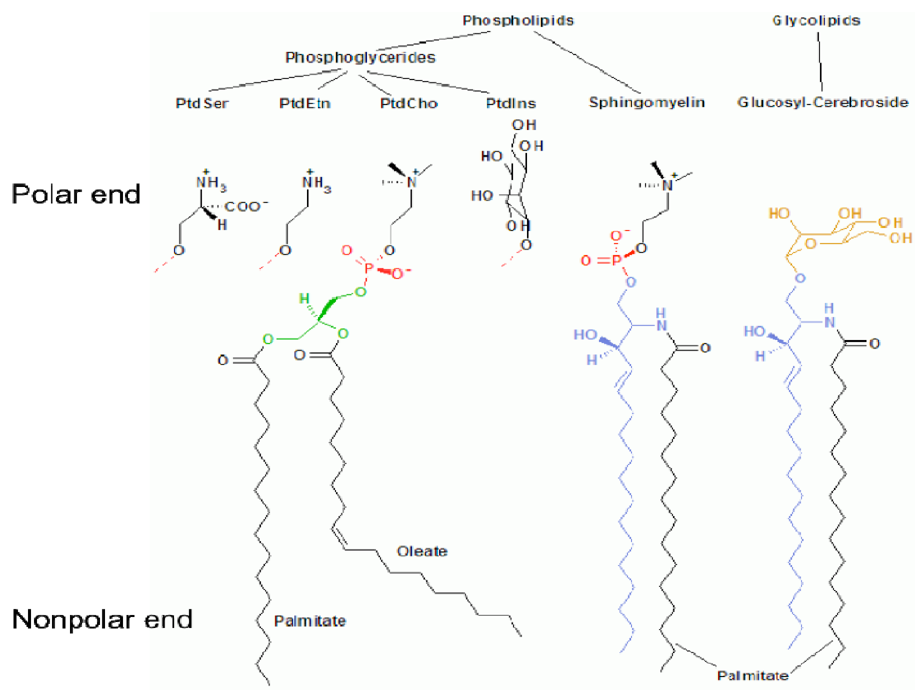

Lipid molecules

লিপিড অণুর গঠন, প্রোটিন বা শর্করা অণুর থেকে বেশ আলাদা। লিপিড অণুর এক প্রান্তে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন এর প্রাধান্য থাকে এবং এই প্রান্তে চার্জ থাকার জন্যে জলীয় তরলে সহজেই মিশে থাকতে পারে (polar end); অন্য প্রান্ত প্রধানত কার্বন ও হাইড্রোজেন দিয়ে তৈরী এবং কোনো চার্জ না থাকায় জলীয় তরলের থেকে সব সময় দূরে থাকতে চায় (nonpolar/hydrophobic end)।

কোষের ভিতর কোষরস এবং বাইরে পেরিপ্লাসম যেহেতু জলীয় তরল দিয়ে তৈরী তাই কোষ পর্দা গঠনের সময় লিপিড অণু গুলি নিজেদের মধ্যে সমঝোতা করে পাশাপাশি দুটি স্তরে এমন ভাবে সজ্জিত হয় যে nonpolar প্রান্তগুলি সবসময় একে-অপরের সংস্পর্শে থাকে আর polar প্রান্তগুলি কোষরস বা পেরিপ্লাসমের সংস্পর্শে থাকে। কোষ-পর্দা দুটি লিপিড এর স্তর দিয়ে তৈরী না হলে তা কখনই স্থিতিশীল হত না।

কোষ-পর্দার প্রধান উপাদান লিপিড হলেও, সেখানে প্রচুর পরিমাণে এবং বিভিন্ন রকমের প্রোটিন উপস্থিত থাকে। প্রকৃতপক্ষে, উপাদানগত দিক দিয়ে দেখতে গেলে কোষ-পর্দাতে প্রোটিন ও ফসফো-লিপিড এর

পরিমান প্রায় সমান। কোষ-পর্দার সঙ্গে যুক্ত প্রোটিনগুলিকে প্রধানত দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়:

১) অবিচ্ছেদ্য মেমব্রেন প্রোটিন (Integral membrane proteins/ transmembrane proteins), এবং

২) প্রান্তিক মেমব্রেন প্রোটিন (Peripheral membrane proteins)।

নাম থেকেই বুঝতে পারছো, অবিচ্ছেদ্য মেমব্রেন প্রোটিন কোষ-পর্দার মধ্যেই সবসময় নিবদ্ধ থাকে কিন্তু প্রান্তিক মেমব্রেন প্রোটিন সময় বিশেষে কোষ-পর্দার সাথে সংযুক্ত হয়। কোষরসের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক পরিবেশের আয়নের সাম্য রক্ষা, পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, কোষ-পর্দার মধ্যে দিয়ে বিশেষ বিশেষ প্রোটিন বা অন্যান্য অণু-পরমাণুর প্রবেশ ও নিকাশী ব্যবস্থায় মেমব্রেন প্রোটিন এর ভূমিকা অপরিসীম। একথা বলাই বাহুল্য, ফসফো-লিপিড আর প্রোটিন এর সমন্বয়ে তৈরী কোষ পর্দার কোনো ইট-পাথরের তৈরী দেয়াল এর মত নিশ্চল সীমারেখা না বরং দ্রুত পরিবর্তনশীল একটি গঠন। কোষ পর্দার Fluid mosaic model সম্পর্কে তোমরা নিশ্চয়ই স্কুলের পাঠ্য পুস্তকে পড়েছ তাই সে বিষয়ে এখানে আর আলোচনা করছি না।

ব্যাকটেরিয়া কোষের অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দার আর আমাদের কোষের কোষ-পর্দার মধ্যে দৃশ্যত খুব একটা তফাৎ না থাকলেও গঠনগত ও উপাদানগত বিস্তর পার্থক্য আছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমাদের কোষ-পর্দার গঠনগত উপাদান গুলির মধ্যে অন্যতম হলো কোলেস্টেরল (মোট লিপিড এর প্রায় ২০%) কিন্তু ব্যাকটেরিয়ার কোষ পর্দাতে কোলেস্টেরল একেবারেই থাকে না! আবার ব্যাকটেরিয়ার বাহ্যিক কোষ-পর্দায় lipidA-এর বহুল উপস্থিতি দেখা গেলেও আমাদের কোষ পর্দাতে কদাচিৎ lipidA দেখা যায়।

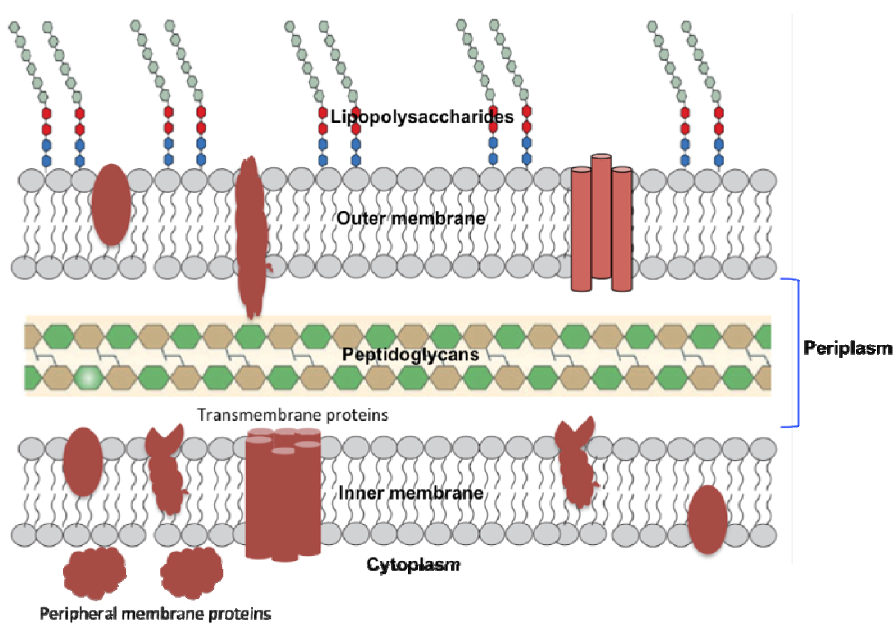

বাহ্যিক কোষ-পর্দা বলতে মনে পড়ল, তোমাদের তো এখনো বলাই হয়নি যে অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা ও বাহ্যিক কোষ-পর্দা উভয়ই দুটি লিপিড স্তর দিয়ে তৈরী হলেও দুটির গঠনগত উপাদান ও বৈশিষ্ট্য কিন্তু অনেকটা স্বতন্ত্র ! তোমরা আগের ছবিতে নিশ্চয় লক্ষ্য করেছ বাহ্যিক কোষ-পর্দার বাইরের দিকের লিপিড স্তরে অনেকটা সরু সরু রোঁয়ার মত গঠন থাকে যাদের লাইপোপলিস্যাকারাইড (lipopolysaccharide: LPS) বলে। প্রতিটি লাইপোপলিস্যাকারাইড অণু একটি লিপিড ও

অনেকগুলো শর্করা অণুর সমন্বয়ে তৈরী। অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দায় কিন্তু এই LPS থাকে না। LPS ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক গঠন কে মজবুত করে ও বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ থেকে ব্যাকটেরিয়াকে রক্ষা করে। জেনে রাখা ভালো, ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে আমাদের অনেক সময় যে জ্বর বা উদরাময় হয় তার অন্যতম প্রধান কারণ এই LPS। তাই LPS এর উপস্থিতি টের পেলেই আমাদের শরীরের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা (immune system) সজাগ হয়ে ওঠে।

এতো গেল অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা ও বাহ্যিক কোষ-পর্দার গল্প, মাঝের কোষ প্রাচীর এর ভূমিকা তাহলে কি ? কোষ প্রাচীরের কাজ কি শুধুই কাঠিন্য প্রদান করা ? ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে আমরা যে অ্যান্টিবায়োটিক (antibiotic) এর ব্যবহার করি তা কোষ প্রাচীর এর গঠনকে কেমন ভাবে নষ্ট করে সেই সব জানতে চলেছি এর পর।

|| ব্যাকটেরিয়ার কোষ-প্রাচীর ও অ্যান্টিবায়োটিকস ||

আমরা ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক আবরণ, বিশেষ করে অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা, বাহ্যিক কোষ-পর্দা ও পেরিপ্লাসমের গঠনগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করেছি। কোষ-পর্দা ও পেরিম্প্লাসমের মাধ্যমেই ব্যাকটেরিয়া পারিপার্শ্বিক পরিবেশের সঙ্গে আয়নের সাম্য রক্ষা, পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে সংকেত আদান-প্রদান, ও বিশেষ বিশেষ প্রোটিন বা অন্যান্য অণু-পরমাণুর প্রবেশ ও নিকাশী ব্যবস্থা বজায় রাখে। কোষ-পর্দা ও পেরিপ্লাসম ছাড়া ব্যাকটেরিয়া কোষের প্রতিরক্ষা বলয়ের অন্যতম অপরিহার্য উপাদান হলো কোষ-প্রাচীর। কোষের নির্দিষ্ট আকৃতি রক্ষা ও দৃঢ়তা প্রদান, অভিস্রবণজনিত চাপ (Turgor pressure) প্রশমন এবং ব্যাকটেরিয়া কোষের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় কোষ-প্রাচীরের ভূমিকা অপরিহার্য।

এইবারে আমরা ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ-প্রাচীরের গঠন সম্পর্কে ভালো করে জানব। একটা কথা মনে আসতেই পারে যে ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ-প্রাচীর সম্পর্কে আমাদের জানার বিশেষ প্রয়োজন আছে কি? কোষ-প্রাচীর ছাড়াও তো উন্নত ইউক্যারিওটরা দিব্যি বেঁচে-বর্তে আছে! হ্যাঁ, ঠিক এই কারণেই আমাদের কোষ প্রাচীর সম্পর্কে আরো ভালো করে জানা দরকার! একটু গুছিয়ে বলি তাহলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে।

আমাদের জ্বর, উদরাময় বা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণ হলে যখন ডাক্তারখানায় যাই তখন প্রায়শই ডাক্তারবাবুরা আমাদের অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে থাকেন। জেনে রাখা ভালো, প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিক গুলির বেশীর ভাগ-ই ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ-প্রাচীরকে নষ্ট করে দেয়! কোষ-প্রাচীর নষ্ট হয়ে গেলে এক-কোষী ব্যাকটেরিয়ার পক্ষে অভিস্রবণজনিত চাপ সহ্য করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পরে এবং ব্যাকটেরিয়া কোষটি-ও নষ্ট হয়ে যায়, বিজ্ঞানের ভাষায় একে সেল-লাইসিস (cell Lysis) বলে। আমাদের কোষে যেহেতু কোন কোষ-প্রাচীর থাকে না তাই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রভাবে আমাদের কোষের কোনো ক্ষতি হয় না।

ব্যাকটেরিয়া ঘটিত নানা রোগের নিরাময়ের জন্যে ও আরো উন্নত অ্যান্টিবায়োটিক তৈরির লক্ষ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ল্যাবরেটরিতে বিজ্ঞানীরা নিরলস গবেষণা করে চলেছেন ব্যাকটেরিয়ার

কোষ-প্রাচীরের কার্যগত ও গঠনগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আরো বিশদে জানার জন্যে।

কি দিয়ে তৈরী হয় এই কোষ-প্রাচীর? কি ভাবে ব্যাকটেরিয়া তৈরী করে কোষের বাইরের দৃঢ় আবরণ? সেই বিষয় গুলো তাহলে একটু ভালো করে জেনে নিই এখন।

ব্যাকটেরিয়ার কোষ-প্রাচীরের প্রধান উপাদান হল পেপ্টাইডোগ্লাইকান (Peptidoglycan) বা মিউরিন (murein) নামক পলিমার। শর্করা ও অ্যামিনো অ্যাসিড এর সমন্বয়ে তৈরী পেপ্টাইডোগ্লাইকান পলিমার অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দার (inner membrane) বাইরের দিকে জালের ন্যায় এক ত্রিমাত্রিক সুদৃঢ় ও সুসংঘটিত বিন্যাস গঠন করে। আমাদের বাড়ির চারপাশে যেমন সারি-সারি ইঁট পরপর সাজিয়ে প্রতিরক্ষা বলয় বা প্রাচীর (wall) থাকে, ব্যাকটেরিয়া কোষের ক্ষেত্রেও এই পেপ্টাইডোগ্লাইকান পলিমার অনুরূপ প্রতিরক্ষা বলয় গঠন করে। আর সেই কারণেই এই আবরণের নাম কোষ-প্রাচীর (cell-wall)।

পেপ্টাইডোগ্লাইকানে প্রধানত দুই রকমের শর্করা থাকে: N-acetyl glucosamine (NAG) এবং N-acetylmuramic disaccharide (NAM)।

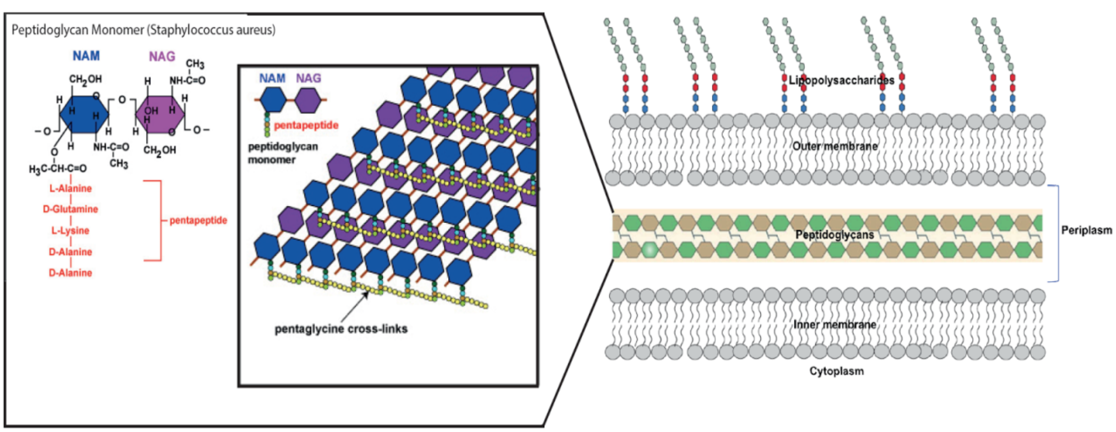

এই N-acetylmuramic disaccharide বা NAM হলো বেশ মজার শর্করা অণু কারণ এর সঙ্গে আবার ৩-৫ টি অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী একটি পেপটাইড শৃঙ্খল যোগ করা থাকে। প্রকৃতিতে শর্করা অণুর সঙ্গে পেপটাইড যুক্ত হয়ে থাকার উদাহরণ কিন্তু খুবই কম। আরও একটা মজার ব্যাপার হলো NAM-এর এই পেপটাইড শৃঙ্খলে যে অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি থাকে সেখানে প্রায়শই D-অ্যামিনো অ্যাসিড-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যেমন D-অ্যালানিন, D-গ্লুটামিক অ্যাসিড এবং D-গ্লুটামাইন (L আর D stereoisomer সম্পর্কে তোমরা রসায়নের ক্লাসে নিশ্চই পড়েছ, এখানে সে বিষয়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করলাম না!)। জেনে রাখা ভালো ইউক্যারিওটিক ও প্রোক্যারিওটিক কোষের লক্ষ-লক্ষ প্রোটিন বিভিন্ন অ্যামিনো অ্যাসিডের সমন্বয়ে তৈরী হলেও সেখানে কিন্তু কখনই D-অ্যামিনো অ্যাসিড থাকে না। এখনো পর্যন্ত আবিষ্কৃত সমস্ত প্রোটিনে কেবলমাত্র L-অ্যামিনো অ্যাসিডের উপস্থিতিই পাওয়া গিয়েছে। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে পেপ্টাইডোগ্লাইকানের গঠনগত এককগুলি কিন্তু প্রকৃতিতে অনন্য!

পেপ্টাইডোগ্লাইকান বা মিউরিনের বিন্যাস গঠনের সময় NAG ও NAM এই দুই শর্করা পর্যায়ক্রমে পরপর সজ্জিত হয়ে অসংখ্য পলিমার তৈরী করে। এককভাবে এই পলিমারগুলি কিন্তু ব্যাকটেরিয়াকে দৃঢ়তা দেবার জন্যে যথেষ্ট নয়। এই পলিমারগুলিকে নিয়ে ত্রিমাত্রিক সুদৃঢ় ও সুসংঘটিত নেটওয়ার্ক তৈরীর কাজটি করে ট্রান্সপেপটাইডেস (Transpeptidase) নামের একটি উৎসেচক (enzyme)। বিভিন্ন শর্করার পলিমার থেকে ঝুলে থাকা পেপটাইড শৃঙ্খলগুলিকে ট্রান্সপেপটাইডেস উৎসেচকটি পেপটাইড-বন্ড এর মাধ্যমে আটকে দেয়। এর ফলে শর্করা আর অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরী পলিমারগুলি একে-অপরের সাথে জুড়ে গিয়ে সুদৃঢ় ত্রিমাত্রিক কোষ-প্রাচীর তৈরী করে।

যদিও কোষ-প্রাচীর তৈরীর এই পুরো প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দা এবং বাহ্যিক কোষ-পর্দার মধ্যবর্তী স্থান পেরিপ্লাসমে, প্রোটিন/উৎসেচক বা পেপ্টাইডোগ্লাইকানের গঠনগত একক গুলি কিন্তু পেরিপ্লাসমে তৈরী হয় না। সে সবই তৈরী হয় কোষ রস বা cytoplasm-এ। অন্তর্বর্তী কোষ-পর্দায় যে অবিচ্ছেদ্য মেমব্রেন প্রোটিন (Integral membrane proteins) থাকে তাদের মাধ্যমেই কোষ-প্রাচীর তৈরীর উপাদানগুলি পেরিপ্লাসমে পরিবাহিত হয়ে থাকে।

যে সমস্ত উৎসেচকগুলি কোষরসে পেপ্টাইডোগ্লাইকানের গঠনগত একক তৈরীতে সাহায্য করে, যে সব মেমব্রেন প্রোটিন তাদের পেরিপ্লাসমে পরিবহন করতে সাহায্য করে এবং যে সব উৎসেচকের সহায়তায় পেরিপ্লাসমে কোষ-প্রাচীর তৈরী হয়, সেই সব প্রোটিন/উৎসেচকগুলিকে অ্যান্টিবায়োটিক চিকিৎসায় গুরুত্বপূর্ণ বলে ধরা হয়ে থাকে।

কিছু প্রচলিত অ্যান্টিবায়োটিকের উদাহরণ যে গুলি ব্যাকটেরিয়ার কোষ-প্রাচীর নষ্ট করে

অ্যান্টিবায়োটিকের নাম	কি ভাবে কাজ করে
Amoxicillin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Ertapenem	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Loracarbef	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Ampicillin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Bacitracin	পেপ্টাইডোগ্লাইকানের গঠনগত একক গুলির পেরিপ্লাসমে পরিবহন বন্ধ করে
Flucloxacillin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Carbenicillin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Vancomycin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়
Cefalexin	কোষ-প্রাচীর তৈরীতে বাধা দেয়

মানুষ আর ব্যাকটেরিয়ার লড়াই: সুপার-বাগ বনাম অ্যান্টিবায়োটিকস

তাহলে আমরা জীবাণুদের বাসস্থান, তাদের নানা প্রকারভেদ, বৈচিত্র্যময় গঠন ইত্যাদি বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে ফেলেছি। আকারে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হলেও গঠনগত দিক দিয়ে তারা যে অনেক জটিল এবং তাদের কোষের বাহ্যিক প্রতিরক্ষা বলয় যে অনেক বেশী সুসংগঠিত সে বিষয়েও আমরা অনেক কিছু জেনেছি। উন্নত ইউক্যারিওটদের থেকে ব্যাকটেরিয়া কোষের বাহ্যিক আবরণের প্রধান পার্থক্যটি হল, ব্যাকটেরিয়া কোষের বাইরে কোষ-পর্দা ছাড়াও কোষ-প্রাচীরের দৃঢ় আচ্ছাদন থাকে। আর এই কোষ-প্রাচীরের উপস্থিতির জন্যই প্রতিকূল পরিবেশেও ব্যাকটেরিয়া অভিস্রবণজনিত চাপ (Turgor pressure) থেকে নিজেদের সুরক্ষিত রাখতে পারে। কোনো কারণে যদি ব্যাকটেরিয়া

কোষের এই প্রতিরক্ষা বলয় নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ব্যাকটেরিয়া কোষটি অভিস্রবণ জনিত চাপ সহ্য করতে না পেরে মারা যায়। আর এই কারণেই দৈনন্দিন জীবনে বহুল ব্যবহৃত অ্যান্টিবায়োটিকস গুলির বেশীর ভাগের-ই নিশানা হল ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ-প্রাচীর। এই পর্বে আমরা অ্যান্টিবায়োটিকস কীভাবে কোষ-প্রাচীরের গঠন নষ্ট করে এবং কিছু 'সুপার' ব্যাকটেরিয়া তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে সেই বিষয়ে আলোচনা করব।

আমাদের যখন শরীর খারাপ হয় তখন ডাক্তারের কাছে গেলে প্রায়শই তাঁরা আমাদের অ্যান্টিবায়োটিকস খেতে বলেন। ঠান্ডালাগা, কোথাও ছড়ে যাওয়ার মত সাধারণ সমস্যা বা প্লেগ, হুপিং কাশির মত মহামারী সবের-ই এক সমাধান – অ্যান্টিবায়োটিকস! তোমাদের নিশ্চয়ই জানতে ইচ্ছে করে এই অ্যান্টিবায়োটিকস-এ কী এমন ম্যাজিক থাকে যে ভয়ংকর সব ব্যাকটেরিয়া পালাবার পথ খুঁজে পায় না?

এই বিষয়ে জানার আগে চট করে আমরা একটু আগের বিষয়টা ঝালিয়ে নেব। আগে (পর্ব-৫) আমরা আলোচনা করেছিলাম যে NAG ও NAM এই দুই অদ্ভুত শর্করার সমন্বয়ে তৈরী হয় পেপ্টাইডোগ্লাইকান পলিমার। অসংখ্য পেপ্টাইডোগ্লাইকান পলিমার একসঙ্গে মিলে ব্যাকটেরিয়ার পেরিপ্লাসমে ত্রিমাত্রিক জালের ন্যায় কোষ-প্রাচীর তৈরী করে। NAG ও NAM এই দুই শর্করার অণুকে পরপর সাজিয়ে পলিমার তৈরী ও এই পলিমার গুলিকে জুড়ে ত্রিমাত্রিক সজ্জায় সাজানোর কাজ করে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একদল প্রোটিন বা উৎসেচক। এদের পেনিসিলিন-বাইন্ডিং-প্রোটিন (Penicillin-binding proteins) বা PBPs বলা হয়।

তোমরা কি আন্দাজ করতে পারো কেন এদের পেনিসিলিন-বাইন্ডিং-প্রোটিন বলা হয়? কারণটা

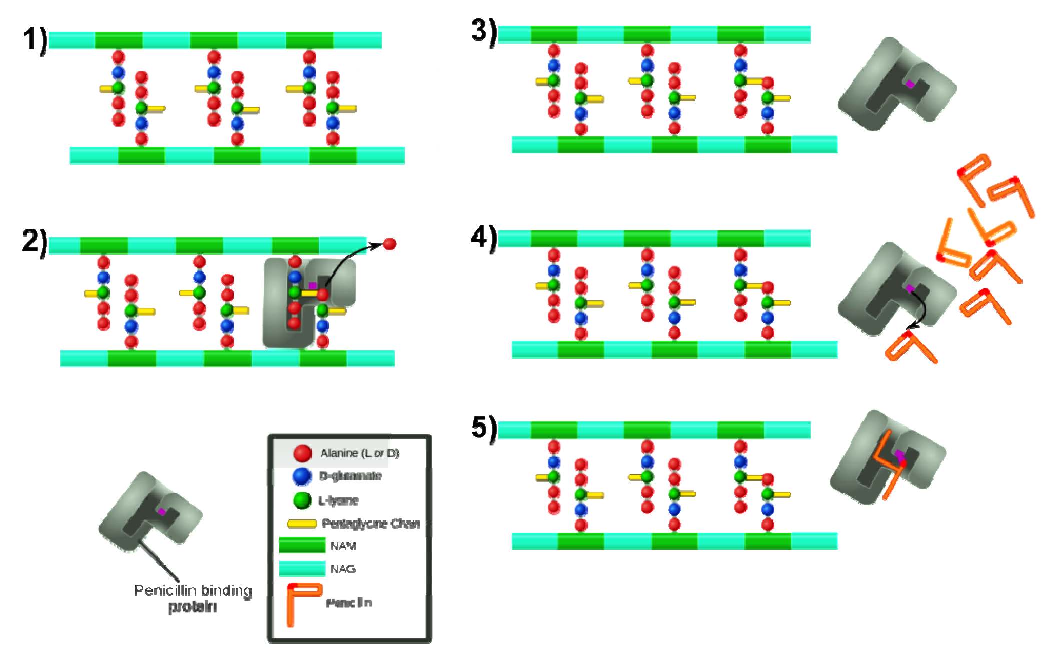

PBP-দের ভূমিকা ব্যাকটেরিয়া কোষের বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য। পেনিসিলিন বা পেনিসিলিন গোত্রের যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিক এই PBP-দের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওদের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। ক্লিক করুন ভাল রেসোল্যুশনে দেখতে। (উৎস- উইকিপিডিয়া)

খুব-ই সহজ! পেনিসিলিন বা পেনিসিলিন গোত্রের যে কোনো অ্যান্টিবায়োটিকস আসলে এই শ্রেণীর উৎসেচক গুলির সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওদের কার্যকারিতা নষ্ট করে দেয়। তাই এই প্রোটিন বা উৎসেচক গুলিকে পেনিসিলিন-বাইন্ডিং-প্রোটিন বলে। এই প্রক্রিয়ার ফলে ব্যাকটেরিয়া কোষের কোষ-প্রাচীর তৈরী হয় না এবং কোষটিও নষ্ট হয়ে যায়।

PBP-র উপস্থিতি প্রায় সব ব্যাকটেরিয়াতেই দেখা যায় এবং ওদের ভূমিকা ব্যাকটেরিয়া কোষের বেঁচে থাকার জন্যে অপরিহার্য। তাই পেনিসিলিন গোত্রের বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকস গুলি (Amoxicillin, Cephamycins, Carbapenems, Flucloxacillin ইত্যাদি) ডাক্তারবাবুরা আমাদের ব্যাকটেরিয়া-ঘটিত রোগ সরানোর জন্যে প্রায়শই দিয়ে থাকেন।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

লেখক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-এর সঙ্গে যুক্ত।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2014/12/21/jibanuder-jato-katha/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ ৮-টি পর্বে প্রকাশিত হয়েছিল।

বিজ্ঞানীদের ছবি সৌজন্যে: উইকিপিডিয়া
প্রচ্ছদের ছবিটির উৎস:
http://guardianlv.com/wp-content/uploads/2013/11/cholera-virus-or-bacteria-nhbn3b8t.jpg

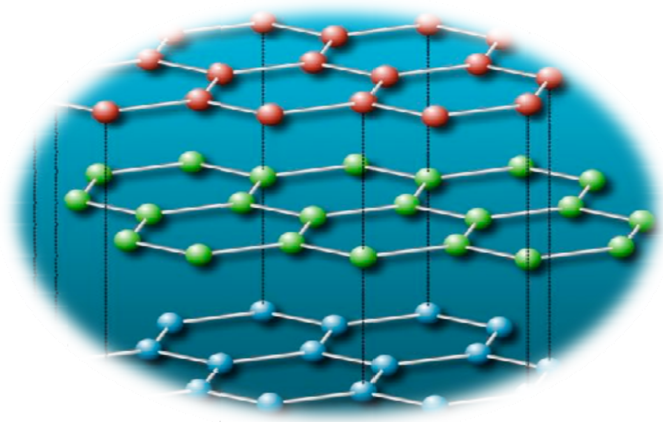

গ্রাফিন-এ ডিরাক সমীকরণ: টেবিলের উপর আপেক্ষিকতাবাদের পরীক্ষা

কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত

|| গোড়ার কথা ||

গত শতাব্দীর শুরুর দিকে পদার্থবিদ্যায় দুটি নতুন ধারার সূত্রপাত হয়। একটি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ বা স্পেশাল রিলেটিভিটি (special relativity) এবং অন্যটি কোয়ান্টাম বলবিদ্যা (quantum mechanics)। প্রথমটি আসে ১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের হাত ধরে। আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিতে ধাবমান যে কোনো বস্তুর ধর্মকে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় [১]। অন্য ধারাটি প্রায় সমসাময়িকভাবে আসে বেশ কয়েকজন পদার্থবিদের কাজের মাধ্যমে; প্লাঙ্ক, আইনস্টাইন, ডি ব্রয়লি ও শ্রোয়েডিঙ্গার তাঁদের মধ্যে অন্যতম। অতিক্ষুদ্র কণা, যেমন অণুর থেকেও ছোট ইলেক্ট্রনকে ব্যাখ্যা করতে হলে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার প্রয়োজন। কিন্তু, সেই ইলেক্ট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের থেকে অনেক কম হলে তবেই এই তত্ত্ব দিয়ে তাদের ধর্মকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। অতএব দুটি আলাদা জগতের ধর্ম ব্যাখ্যা করার জন্য দুটি আলাদা তত্ত্ব বা থিওরি (theory) তৈরী হয়। এদের চরিত্র অনেকটাই আলাদা। ফলত এই দুটি থিওরি-র মেলবন্ধন ঘটিয়ে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিতে ধাবমান একটি ইলেক্ট্রনের গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা মোটেই সোজা ছিল না [২]।

৯২৭ সালে এই সমস্যাটিই ভাবাচ্ছিল ব্রিটিশ পদার্থবিদ পল এড্রিয়ান মরিস ডিরাক-কে। তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে অবশেষে এই সমস্যাটির একটি সমাধান বের হয়। ডিরাক দেখান যে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগসম্পন্ন ইলেক্ট্রন-দের

ধর্ম বোঝাতে গেলে প্রয়োজন একটি নতুন সমীকরণের যাকে আমরা এখন ডিরাক সমীকরণ নামে জানি।

ডিরাক

অতএব ডিরাক সমীকরণের মাধমে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা আর বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সমন্বয় ঘটে। কিন্তু এই ডিরাক সমীকরণটির এমন কিছু অদ্ভুত সমাধান ছিল, যা সাধারণ কোয়ান্টাম বলবিদ্যার শ্রোয়েডিঙ্গারের সমীকরণে ছিল না। যেমন, এই সমীকরণ থেকে জানা যায় যে ঋণাত্মক আধানসম্পন্ন ইলেক্ট্রনের এক জাতভাই আছে – পজিট্রন- যার ভর ইলেক্ট্রনের সমান কিন্তু আধান ধনাত্মক। এধরণের কণা থাকার সম্ভাবনা ডিরাক-এর সমীকরণের একটি বড় সাফল্য। ১৯৩২ সালে কার্ল ডেভিড অ্যান্ডার্সন এই কণাটিকে ক্লাউড চেম্বারে শনাক্ত করেন। কিন্তু, শেষমেশ ডিরাক-এর সমীকরণ যথেষ্ট ছিল না। আলোর গতিবেগের কাছাকাছি ইলেক্ট্রনদের বুঝতে হলে একই তত্ত্বের আওতায় আলোককণা ও তার সাথে ইলেক্ট্রনের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে ধরা প্রয়োজন। এই কাজটি করতে গিয়ে জন্ম হয় কোয়ান্টাম ইলেক্ট্রোডাইনামিক্স (quantum electrodynamics)-এর, যাকে পদার্থবিদ্যার জগতে অন্যতম সফল একটি থিওরি বলা চলে [৩]।

এর ফলে ডিরাক-এর সমীকরণ ও তার সমাধানের বিচিত্র ধর্ম আর পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা হয় না।

|| বিশ বছর পর ||

ডিরাক-এর সমীকরণটি আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বছর পর এক কানাডিয়ান পদার্থবিদ ফিলিপ রাসেল ওয়ালেস গ্রাফাইট নিয়ে গবেষণা করছিলেন। গ্রাফাইট-এর সাথে আমরা সবচেয়ে ভালোভাবে পরিচিত পেন্সিল-এর সীসের মাধ্যমে। ছোটবেলায় কেমিস্ট্রি বইয়ে বহুরূপী মৌল কার্বন-এর সবচেয়ে পরিচিত রূপভেদ হিসেবে গ্রাফাইট-এর কথাই আমরা শিখেছি।

গ্রাফাইট-এর গঠন অনেকটা এইরকম। ভাবা যাক যে স্তরে স্তরে একের পিঠে আরেকটি সমতল বসানো। একেকটি তলায় খাপে খাপ মিলিয়ে রয়েছে ষড়ভুজ বা হেক্সাগন (hexagon) আর সেই ষড়ভুজের কোণাগুলিতে রাখা রয়েছে কার্বন অণুদের। একই তলায় যে কার্বন অণুগুলি রয়েছে, তাদের মধ্যে রাসায়নিক বন্ধন খুবই দৃঢ়। কিন্তু, প্রতিবেশী সমতলগুলির কার্বন অণুদের মধ্যে সেই বন্ধন নেই বললেই চলে।

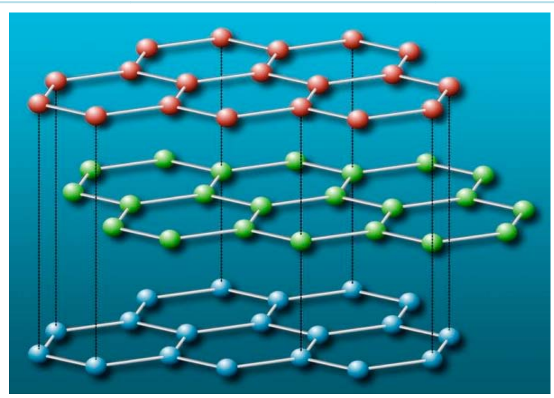

গ্রাফাইট-এর গঠন

ওয়ালেস যখন তাত্ত্বিকভাবে গ্রাফাইট নিয়ে গবেষণা করছেন, তদ্দিনে তার উপর পরীক্ষামূলক গবেষণা অনেকদূর এগিয়েছে। যেমন, ভারতীয় পদার্থবিদ কে. এস. কৃষ্ণান গ্রাফাইটের উপর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে ফেলেছেন। জানা গিয়েছে, গ্রাফাইট-এর মধ্যে তাপ বা বিদ্যুৎ পরিবাহিতা সব দিকে সমান নয় [৪]।

এই পরিস্থিতিতে, তাত্ত্বিকভাবে গ্রাফাইট-এর মধ্যে ইলেক্ট্রন চলাচলের উপর গবেষণা করছিলেন ওয়ালেস। 'টাইট বাইন্ডিং মডেল' (tight-binding model) নামে এক পদ্ধতির সাহায্যে। পদ্ধতিটিতে একটি 'ল্যাটিস' (lattice) থেকে শুরু করা হয়। ল্যাটিস হলো শূন্যে নিয়মিত দূরত্বে সাজানো বিন্দু। যেমন, নিচে একটি দ্বিমাত্রিক ল্যাটিসের ছবি দেওয়া হলো:

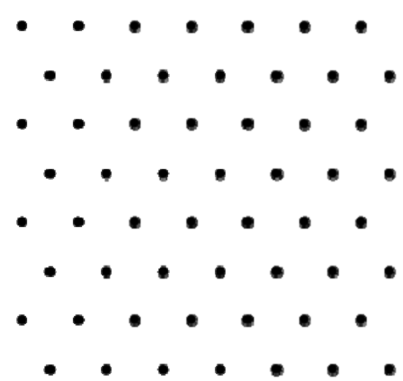

দ্বিমাত্রিক ল্যাটিস

একটি চলন্ত ইলেক্ট্রনের অবস্থান যদি এই ল্যাটিসের বিন্দুগুলির মধ্যেই সীমিত থাকে, তাহলে তার গতিশক্তিকে এমনভাবে লেখা যাবে যেন সে একটি বিন্দু থেকে আরেকটি বিন্দুতে লাফাচ্ছে। একটি বিন্দু ধ্বংস হওয়ার সাথে সাথে তার প্রতিবেশী বিন্দু সৃষ্টি হচ্ছে। সংক্ষেপে এটিই 'টাইট বাইন্ডিং মডেল'। এই মডেলটি কিভাবে তৈরী হয়, সেই অঙ্কের বিশদ বর্ণনায় গেলাম না, কিন্তু এটি যে কোনো ল্যাটিস-এর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রাফাইট-এর এক একটি সমতলে যে ষড়ভুজাকার ল্যাটিস রয়েছে, ওয়ালেস এই মডেলটি তার উপর বসিয়ে অঙ্ক কষলেন। তিনি দেখালেন যে গ্রাফাইট-এর সমতলগুলির মধ্যে যে যৎসামান্য বন্ধন রয়েছে, তাকে যদি উপেক্ষা করা যায়, তাহলে এক একটি তলার ইলেক্ট্রনগুলি ডিরাক সমীকরণ মেনে চলে। হ্যাঁ, ঠিক সেই ডিরাক সমীকরণ যেটি আবিষ্কার হয়েছিল আলোর গতিবেগের কাছাকাছি বেগে ছুটন্ত মুক্ত, বন্ধনহীন ইলেক্ট্রন-এর জন্য! ওয়ালেসের কাজ দেখায় যে একই সমীকরণ খাটে গ্রাফাইটের একটি তলায় ষড়ভুজাকার ল্যাটিস-এ আবদ্ধ ইলেক্ট্রনদের জন্যেও! যদিও ইলেক্ট্রনগুলির গতিবেগ আলোর গতিবেগের মাত্র ১/১০০ ভগ্নাংশ মতো।

কিন্তু, এতদিন অব্দি এই পুরো ব্যাপারটাই তাত্ত্বিক স্তরে ছিল। গ্রাফাইটে তো স্তরে স্তরে সমতলগুলি বসানো রয়েছে, তার মধ্যে থেকে একটি স্তর-কে আলাদা করবে কে? মনে রাখতে হবে, ডিরাক সমীকরণ পেতে গেলে স্তরগুলির মধ্যে বন্ধনকে শূন্য হতে হবে; ওয়ালেস দেখালেন যে বন্ধনগুলিকে বাদ না দিলে ডিরাক সমীকরণ পাওয়া অসম্ভব। তাই, একটি স্তর-কে আলাদা করতে না পারলে পরীক্ষামূলকভাবে ওয়ালেস-এর আবিষ্কার যাচাই করা সম্ভব নয়। অতএব, পদার্থবিদদের মধ্যে যাঁরা বস্তুর ভিতর ইলেক্ট্রন চলাচল নিয়ে মাথা ঘামান, তাঁরা এই ডিরাক সমীকরণের পুনরাবির্ভাবকে পাত্তা দিলেন না।

|| একবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ||

ম্যানচেস্টার, ইংল্যান্ড, ২০০৪। আন্দ্রে গাইম আর কনস্টান্টিন নোভোসেলভ এই তাত্ত্বিক কল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করলেন। গ্রাফাইট-এর উপর স্কচ টেপ (আমরা যাকে সেলোটেপ বলি) দিয়ে ঘষলে যে পাতলা গ্রাফাইট-এর আঁশগুলো বেরোয়, তার মধ্যে থেকে একটি মাত্র স্তরকে আলাদা করতে সক্ষম হলেন তারা। একটি স্তর, যার উপর ষড়ভুজাকার ল্যাটিস-এর কোনায় কোনায় বসে আছে কার্বন অণু। একেই আমরা 'গ্রাফিন' নামে জানি।

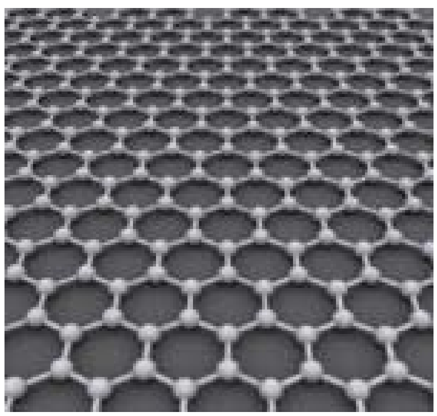

গ্রাফিন

তাঁদের যুগান্তকারী গবেষণাপত্রটি ২০০৪-এ 'সায়েন্স' পত্রিকতে বেরোলো [৫]। এই গবেষণাটি এবং তার পরবর্তী কয়েকটি কাজের ফলে দেখা গেল যে গ্রাফিন-এর মধ্যে ইলেক্ট্রন চলাচল সাধারণ ধাতুর থেকে একদম আলাদা। এবং এই ইলেক্ট্রন চলাচলকে বুঝতে হলে ডিরাক সমীকরণের সাহায্য নিতেই হবে। এর ফলে তাত্ত্বিক এবং পরীক্ষামূলক ঘন বস্তুর পদার্থবিদ্যা বা কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স (condensed matter physics), দুটি ধারাতেই একটি নতুন জগৎ খুলে গেল। ডিরাক সমীকরণ যে সূত্রে প্রথম এসেছিলো, সেই কণাপদার্থবিদ্যার জগতে তাকে পরীক্ষামূলকভাবে যাচাই করা যায়নি। কারণ কণাপদার্থবিদ্যার যে কোনো পরীক্ষায় একসাথে আলোককণা এবং ইলেক্ট্রন, দুটিই ধর্তব্যের মধ্যে এসে যায়। 'গ্রাফিন'-এ ইলেক্ট্রনের গতিবেগ আলোর গতিবেগের তুলনায় অনেক কম হওয়াতে সেই সমস্যাটি নেই।

দ্বিতীয়ত, 'গ্রাফিন' (বা যে কোনো ঘন বস্তুর ভিতর) ইলেক্ট্রন-রা একে অপরকে প্রভাবিত করে। ডিরাক নিজের সমীকরণটি লিখেছিলেন এমন ইলেক্ট্রনের জন্য যে শূন্যে আলোর গতিবেগের কাছাকাছি গতিবেগে ছুটছে। অন্যান্য ইলেক্ট্রনদের দ্বারা প্রভাবিত হলে 'ডিরাক সমীকরণ'-এর 'মুক্ত' ইলেক্ট্রন-দের কি পরিবর্তন হবে, সেটি সম্পূর্ণ নতুন গবেষণার বিষয়।

তবে গ্রাফিন-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো এই যে, 'গ্রাফিন' আসার ফলে সহজে ডিরাক সমীকরণের ভবিষ্যদ্বাণী নিয়ে পরীক্ষামূলক গবেষণা করার একটি উপায় পাওয়া গিয়েছে । এইসব পরীক্ষার জন্য বিশালাকায় যন্ত্রপাতির প্রয়োজন নেই, সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারের টেবিল আর যন্ত্রপাতিই যথেষ্ট।

|| বিচিত্র এই ডিরাক সমীকরণ ||

কিন্তু, এই সমীকরণটি বাস্তবে প্রতিফলিত হলে সেটি আশ্চর্যের ব্যাপার হবে কেন? কারণ, এর সমাধানের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা পোড়খাওয়া কোয়ান্টাম বলবিদ্যার গবেষককেও তাজ্জব বানিয়ে দেয়। তার মধ্যে একটির কথা বলি।

ডিরাক তার সমীকরণটি লেখার বছর দুই পর সুইডিশ পদার্থবিদ অস্কার ক্লাইন একটি অদ্ভুত

জিনিস লক্ষ্য করেন। সমীকরণটি মেনে চলে যেসব ইলেক্ট্রন (সংক্ষেপে, 'ডিরাক ইলেক্ট্রন'), তাদের পথে যদি একটি বাধা তৈরী করা হয়, তারা বেশ অস্বাভাবিকভাবে আচরণ করে।

এখন, স্বাভাবিক-টি কি, সেটিও একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। ক্লাসিকাল বা রোজকার পরিচিত জগতে, একটি দেয়ালের দিকে বল ছুঁড়ে দিলে কি হবে, সেটি বলতে খুব বেশি কসরত করতে হয়না। বলটি দেয়ালের উচ্চতার থেকে নিচে হলে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসবে, আর উচ্চতার উপরে হলে বেরিয়ে যাবে। কোয়ান্টাম জগতে কিন্তু সেরকমটি হয়না। কোয়ান্টাম জগতে ধীরগতির ইলেক্ট্রনদের 'স্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণ' (Schroedinger's equation)-এর মাধ্যমে বোঝানো হয়। একটি বাধার উপস্থিতিতে স্রোয়েডিঙ্গার সমীকরণের সমাধান করলে দেখা যায় যে ইলেক্ট্রন-এর গতিশক্তি যাই হোক, বাধার অপরদিকে ইলেক্ট্রন-টিকে পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থেকেই যায় (নিচের ছবিটিতে দেখ)। ইলেক্ট্রন-এর গতিশক্তি খুব কম হলে সম্ভাবনাটি খুবই ক্ষীণ, কিন্তু ক্লাসিকাল জগতের বলটির মতো একেবারে শূন্য নয়। একে বলে 'টানেলিং' বা সুরঙ্গিকরণ এবং এটি একমাত্র কোয়ান্টাম জগতেই সম্ভব।

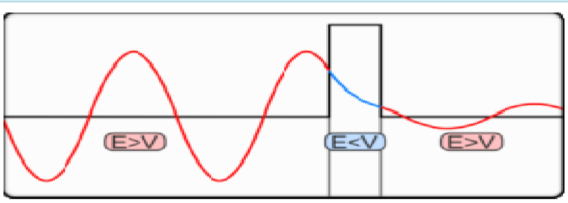

কোয়ান্টাম জগতে টানেলিং (ছবির সূত্র)। ইলেক্ট্রন-টিকে খুঁজে পাওয়ার সম্ভাবনাকে ছবিতে দেখানো তরঙ্গের প্রসার (amplitude)-এর সাথে তুলনা করা যায় (আসলে, amplitude২-এর সমতুল্য)। বাধার উল্টোদিকে তরঙ্গটি একদম প্রবেশ না করলে তার মানে হতো, ইলেক্ট্রন-টি বাধা পেরোতে পারেনি।

খুব অদ্ভুত শোনালেও এই প্রকৃতিটি সম্বন্ধে একটা চেনা ছবি তৈরী করা যায়। একটি ইলেক্ট্রন-এর গতিশক্তি যদি বাধা টপকানোর শক্তির তুলনায় খুব কম হয়, এবং অনেকগুলি এরকম ইলেক্ট্রনকে একটি বাধার দিকে চালিত করা যায়, তাহলে বেশিরভাগ ইলেক্ট্রনগুলিই আটকে যাবে। খুব কম সংখ্যক ইলেক্ট্রনদেরই বাধার উল্টোদিকে পাওয়া যেতে পারে। আর গতিশক্তি যদি দেয়াল পেরোনোর শক্তির তুলনীয় হয়, তাহলে অনেক বেশি ইলেক্ট্রনকে বাধার উল্টোদিকে পাওয়া যাবে। এক কথায়, ইলেক্ট্রন-এর গতিশক্তি বাড়ালে বাধা পার হবার সম্ভাবনা বাড়তে থাকে।

পরিচিত জগতের থেকে অন্যরকম হলেও কোয়ান্টাম জগতের সাথে অভ্যস্ত হতে হতে তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের মনে এই ছবিটি গেঁথে যায়। ডিরাক ইলেক্ট্রন-রা এই ছবিটির মূলে আঘাত করে। অস্কার ক্লাইন দেখালেন যে বাধাটি যথেষ্ট পাতলা হলে সব ইলেক্ট্রন-ই সেটি পেরোতে পারে ! সে বাধার উচ্চতা যাই হোক না কেন, ইলেক্ট্রন-টি সোজাসুজি বাধায় এসে পড়লে সে শতকরা একশোভাগ নিশ্চয়তার সাথে বাধাটি পেরিয়ে যাবে। যেন বাধাটি নেই বললেই চলে ! এটি শুধু আমরা দেয়ালে বল ছুঁড়লে যা দেখি, তার থেকে আলাদা নয়, একেবারে উল্টো! একেই 'ক্লাইন প্যারাডক্স' বলা হয়ে থাকে।

ডিরাক ইলেক্ট্রন-এর এই অদ্ভুত প্রকৃতি পরীক্ষামূলকভাবে আগে যাচাই করা সম্ভব হয়নি। 'গ্রাফিন'-এর সাহায্যে গবেষণাগারের টেবিল-এর উপরই এটি করা সম্ভব। এবং প্রাথমিকভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে এই বাধাহীন চলাচলটি সত্যিই হতে পারে, যদিও নিশ্চিতভাবে এটা প্রমান করতে এখনো অনেক এক্সপেরিমেন্ট-এর প্রয়োজন [৬]।

|| তাহলে কি দাঁড়ালো ||

বলা যায়, ঘনবস্তুর জগতে ‘গ্রাফিন’ প্রথম উদাহরণ যেখানে সম্পূর্ণ আলাদা প্রসঙ্গে বহুকাল আগে লেখা একটি সমীকরণকে কণা পদার্থবিদ্যার জগৎ থেকে বার করে এনে একটি টেবিলের উপর পরীক্ষা করে যাচাই করা সম্ভব হচ্ছে।

আর ঘনবস্তুর পদার্থবিদ্যার জগতেও একটি নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। সাধারণ ধাতুর মধ্যে ইলেক্ট্রনদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। কিন্তু ‘গ্রাফিন’-এর ইলেক্ট্রন আর সাধারণ ধাতুর ইলেক্ট্রনদের মধ্যে অনেক তফাৎ। আমরা দেখলাম, ‘গ্রাফিন’-এর ইলেক্ট্রনকে বুঝতে আলোর কাছাকাছি বেগের পদার্থবিদ্যা ব্যবহার করতে হয়। সেই আলোর কাছাকাছি গতিবেগের পদার্থবিদ্যা মানে যেসব ইলেক্ট্রন, তাদের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া জুড়ে দিলে কি হতে পারে, সেটি ঘনবস্তুর পদার্থবিদ্যার গবেষণায় একটি সম্পূর্ণ নতুন দিক।

তাই, নিঃসন্দেহে বলা যায়, ‘গ্রাফিন’ ঘনবস্তুর বিজ্ঞান জগতে একটি রীতিমতো হইচই সৃষ্টি করেছে।

(লেখাটি মূল ইংরাজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করেছে অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়।)

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ জুলাই ১০, ২০১৭ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

লেখক পরিচিতি ('বিজ্ঞান'-এ প্রকাশিত হওয়ার সময়) :

অধ্যাপক কৃষ্ণেন্দু সেনগুপ্ত ঘনবস্তুর পদার্থবিদ্যা (কনডেন্সড ম্যাটার ফিজিক্স) নিয়ে গবেষণা করেন। বর্তমানে উনি কলকাতা-র ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সাইন্স-এ গবেষণারত। ওনার অনেক গবেষণার বিষয়ের মধ্যে রয়েছে গ্রাফিন জাতীয় ডিরাক সমীকরণের পরিচয়-বহনকারী পদার্থ বা সেইসকল কোয়ান্টাম সিস্টেম যেগুলো সুস্থিত অবস্থার বাইরে। ২০১২ সালে উনি ভাটনাগর পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। ওনার গবেষণা নিয়ে আরো জানতে এখানে দেখুন: http://mailweb.iacs.res.in/theoph/tpks/

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন

http://bigyan.org.in/2017/07/10/dirac_equation_in_graphene/

ছবির উৎস :

- https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Dirac
- http://orientallinkholding.com/GRAPHITE.php
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AGraphen.jpg
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File:TunnelEffektKling1.png

তথ্যসূত্র ও অন্যান্য টুকিটাকি:

[১] আইনস্টাইন-এর স্পেশাল রিলেটিভিটি একটা ‘ক্লাসিকাল’ বা সনাতনী বর্ণনা। আমরা খালি চোখে যা দেখি বা তার থেকেও অনেক ছোট বস্তু, তাকে এই বর্ণনার সাহায্যে বোঝা যায়। কিন্তু ইলেক্ট্রন-এর মতো ক্ষুদ্রের জগতে চলে গেলে, তখন ‘কোয়ান্টাম বলবিদ্যা’-র শরণাপন্ন হতে হয়। ‘ক্লাসিকাল’

আর 'কোয়ান্টাম' জগতের সীমারেখাটা কোথায়, সেই নিয়ে 'বিজ্ঞান'-এ লেখা 'ক-এ কোয়ান্টাম' পড়ুন।

[২] কেন বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ আর কোয়ান্টাম মেকানিক্স একে অপরের সাথে খাপ খায় না, সেটা জানতে হলে আগে বুঝতে হবে খাপ খাওয়া মানে কি। উদাহরণ হিসাবে তড়িৎ-গতিবিদ্যার ম্যাক্সওয়েলের সূত্রগুলি ধরা যায়। এই সূত্রগুলি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অর্থাৎ, এক ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম (inertial reference frame) থেকে আরেক ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম-এ যদি বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মেনে যাওয়া যায়, তাহলে সূত্রগুলি অপরিবর্তিত থাকে। কেউ যদি দুটো আলাদা ইনারশিয়াল রেফারেন্স ফ্রেম-এ কোনো রাশি পরিমাপ করার জন্য পরীক্ষা করে, তাহলে একই উত্তর পাবে। ম্যাক্সওয়েলের সূত্র ছাড়াও আরো অনেক সূত্র এক ফ্রেম থেকে আরেক ফ্রেম-এ গেলে অপরিবর্তিত থাকে। কোয়ান্টাম মেকানিক্স-এর শ্রোডিংগার সূত্রটি এদের মধ্যে পড়ে না। অর্থাৎ, বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মেনে রেফারেন্স ফ্রেম পরিবর্তন করলে অপরিবর্তিত থাকে না। যেহেতু আলোর গতির কাছাকাছি গতিতে ধাবমান কণাকে ব্যাখ্যা করতে বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ মানতেই হবে, তাই এদের ধর্ম শ্রোডিংগার সূত্র দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

[৩] পরীক্ষার মাধ্যমে কোনো তত্ত্ব যাচাই করা গেলেই বিজ্ঞানে সেই তত্ত্বকে সফল হিসেবে ধরা হয়।

[৪]
http://www.jstor.org/stable/24101915?seq=1#page_scan_tab_contents
ও
http://www.nature.com/nature/journal/v144/n3650/abs/144667a0.html

[৫] আন্দ্রে গাইম আর কনস্টান্টিন নোভোসেলভ-এর নোবেলজয়ী গ্রাফিন-সংক্রান্ত কাজ নিয়ে এখানে পড়ুন: http://science.sciencemag.org/content/306/5696/666 । লেখাটি বিনামূল্যে পাওয়া যায়, শুধু আপনাকে AAAS-এ একটা একাউন্ট খুলতে হবে।

[৬] Rev. Mod. Phys. 81, 109 (2009) – The electronic properties of graphene

ধাঁধা: ছোট্ট গাউস আর রেলগাড়ির অঙ্ক

অর্ক ব্যানার্জী

আমাদের অনেকেরই স্কুল, কলেজ বা কর্মক্ষেত্রে রোজকার যাতায়াতের এক অতি পরিচিত মাধ্যম হল রেলগাড়ী। মূলত লোকাল ট্রেন। আর এই ট্রেনে যাতায়াতের পথে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতাই না হয়ে থাকে আমাদের। আমার কলেজ আর ইউনিভার্সিটির পাঁচ বছরের পুরোটাই এই লোকাল ট্রেনের সুবাদে টুকরো টুকরো নানা মজার ঘটনার স্মৃতিতে ভরা। তোমাদের কেউ যদি বিকেলবেলায় শিয়ালদহ মেইন্ স্টেশন হয়ে কোনো ট্রেন ধরে থাকো, তাহলে অনেকেই হয়তো এক বিক্রেতাকে জোর গলায় "পচা বাদাম" অতি সাফল্যের সাথে বিক্রি করে থাকতে লক্ষ্য করে থাকবে। তো আজ এইরকমই মজার এক (থুড়ি দুই) ধাঁধার-ছলে-গল্প বা গল্পর-ছলে-ধাঁধা তোমাদের বলি।

প্রথমে ধাঁধাটায় আসি, তারপর গল্পে (শেষপাতে গল্প শুনতে কার না ভাল লাগে!)। তো এই ধাঁধাটা আসলে এক অদ্ভুত ফেরিওয়ালার গল্প: এক অঙ্কের ফেরিওয়ালা। সেদিন দুপুরবেলায় কলেজ থেকে বাড়ি ফিরছি। রোজকার মত অনেক ফেরিওয়ালাই তাদের বিকিকিনি সারছেন। এমন সময় আমার দুপুরের ঝিমুনিভাবটা পুরোপুরি উড়িয়ে দিল কানে আসা কিছু শব্দ। একটা লোক বলে কিনা "দেখি এই প্রশ্নের উত্তর এখানে উপস্থিত কেউ দিতে পারেন কিনা!" আমিও কান পেতে তৈরি কি প্রশ্ন তা শোনার অপেক্ষায়।

প্রশ্নটা হল এইরকম- "এক বৃদ্ধের ছয় পুত্র, বৃদ্ধ বিপত্নীক। তার পুত্রেরা চায় বৃদ্ধ পিতা তাদের যাকিছু সম্পত্তি সমান ভাগে ভাগ করে দিক। এখন এই বৃদ্ধের সম্পত্তির মধ্যে তার বাড়ি-জমি-অর্থ ইত্যাদি ছাড়াও আছে ৩৬ টি গরু। তারা যেমনতেমন গরু নয়। প্রত্যেকটি গরু তাদের ক্রমিক সংখ্যানুসারে চিহ্নিত, অর্থাৎ ১ নং গরু, ২ নং গরু, ৩ নং গরু....... এইরকম করে ৩৬ নং গরু অবধি। আর আরো মজার ব্যাপার হল ১ নং গরু দেয় ১ লিটার দুধ, ২ নং ২ লিটার, ৩ নং ৩ লিটার....... এই ক্রমানুসারে ৩৬ নং গরু ৩৬ লিটার দুধ। এখন ছেলেরা তাদের বাবাকে বলে গরুও যেন তাদের ভাগ করে দেওয়া হয়, আর এমনভাবে

দেওয়া হয় যাতে প্রত্যেকে সমান সংখ্যক গরু পায় এবং প্রত্যেকের ভাগে সমান দুধের পরিমাণও থাকে। অর্থাৎ প্রত্যেক পুত্রই যেন ৬ টি করে গরু পায় আর এই ৬ টি গরুর দুধের সমষ্টিও যেন সমান হয় সবার ক্ষেত্রে। তো বৃদ্ধ এখন কিরকম করে তার এই ৩৬ টি গরু তার ৬ পুত্রের মধ্যে ভাগ করবেন?"

বুঝলাম প্রশ্নকর্তা আসলে এক বই-বিক্রেতা, যে বইতে ছড়িয়ে আছে এইরকমই মজার নানা অঙ্ক। এই প্রশ্নটা তারই একটা মোক্ষম ট্রেইলর্-বিশেষ। তোমরাও চেষ্টা কর এর সমাধান কি হবে ভেবে বার করার। এই অঙ্কটা শোনামাত্রই আমার এক অঙ্কের স্যারের বলা একটা গল্প মনে পড়ে গিয়েছিল। সেই গল্পটাই এবার তোমাদের শোনাব। যদিও সেই অঙ্কের বইটা আমার কেনা হয়নি সেদিন আর, সেই বইবিক্রেতাকে কানে কানে উত্তরটা বলে আমার গন্তব্য স্টেশনে নেমে গিয়েছিলাম।

এবার আমাদের অঙ্কের ক্লাসের সেই গল্পটা বলি শোন- আসলে গল্প নয়, এ এক সত্যি ঘটনা। গল্পের হিরো যে তাঁর নাম ইয়োহ্যান কার্ল ফ্রেইডরিচ্ গাউস (Johann Carl Friedrich Gauss)। জন্ম ১৭৭৭ সালে জার্মানির ব্রাউনসোয়াইগ (Braunschweig) নামের ছোট্ট এক শহরে। গাউসকে বলা হয় "Princeps mathematicorum" যার ইংরিজী করলে হয় "The Prince of Mathematicians"। প্রকৃত অর্থেই গাউসের নাম গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিদ্যায় বারেবারে ফিরে আসে। মাত্র তিন বছরের বয়সেই গাউস তার বাবার করা হিসাবের খাতার যোগফল মিলিয়ে তাতে কোনো ভুল রয়েছে কিনা বলতে পারতেন।

গাউস স্কুলে ভর্তি হন সাত বছর বয়েসে। আমাদের গল্প শুরু হয় এর ঠিক তিন বছর পর। গাউস তখন মাত্র দশ বছরের। এই প্রথম তাঁকে arithmetic অর্থাৎ গণিতের প্রাথমিক ক্লাসে ভর্তি হতে হয়। তাঁদের ক্লাস নিতেন বুট্‌নার (Büttner) নামের এক খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক। বুট্‌নারের কাজই ছিল বাচ্চাদের ভয়ানক বড় বড় যোগফল নির্ণয় করতে দিয়ে অঙ্কের প্রতি ভীতি তৈরি করা। গাউসের সেদিন ছিল বুট্‌নারের ক্লাসে প্রথম দিন। বুট্‌নার ক্লাসে এসেই ভয়ানক এক যোগফল নির্ণয় করতে দিলেন- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সমস্ত পূর্ণসংখ্যার যোগফল। আর যে যে করতে পারবে তারা তাদের স্লেট এসে জমা করবে বুট্‌নারের কাছে। বুট্‌নার জানতেন সারাদিন পেরিয়ে গেলেও এই যোগফল বার করা কোনো ছাত্রের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই মনে মনে টেবিলে একটু জিরিয়ে নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অঙ্কটা কষতে দিতে দিতেই।

কিন্তু ক্লাসে আসা নতুন ছাত্রটিকে তার জানা ছিল না। বুট্‌নারের কথা শেষ হতে না হতেই তার স্লেটটি নিয়ে সে এগিয়ে যায় আর বলে "Ligget se" ("এই রইল")। স্লেটের ওপর লেখা একটাই সংখ্যা "৫০৫০"- ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল পূর্ণসংখ্যার যোগফল। বলা বাহুল্য, সারাক্লাসের শেষে আর যে দু একজন স্লেট জমা করেছিল তাদের কারুরই যোগফল নির্ণয় সঠিক হয়নি। একমাত্র প্রথমদিন ক্লাসে আসা গাউসই দিয়েছিলেন সঠিক উত্তর, আর তা বার করতে তাঁর লেগেছিল কয়েক মুহূর্তমাত্র। বুট্‌নারের গাউসের প্রতিভাকে চিনতে কিন্তু দেরি হয়নি সেদিন।

শুরুর রেলগাড়ির প্রশ্ন আর বুট্‌নারের করা প্রশ্নদুটি শুনতে আপাতদৃষ্টিতে আলাদা আলাদা রকমের মনে হলেও আসলে তাদের সহজ সমাধান কিন্তু করা সম্ভব একইরকম যুক্তি খাটিয়ে- কি সেটা এখনই বলছি না, সেটাই এই ধাঁধাঁর ভাব্‌বার বিষয়। ক্লু হিসাবে এইটুকু বলতে পারি আগে গাউস ঐ যোগফলটি কি করে অত সহজে বার করেছিলেন সেটা ভেবে বার কর, তাহলেই রেলগাড়ির অঙ্কের

সমাধানও হয়ে যাবে চট্‌পট্‌। বুদ্ধিটা ধরে ফেলতে পারলেই দেখবে এক নিমিষে নিজেরই অজান্তে পৌঁছে গিয়েছ ব্রাউনসোয়াইগের সেই ছোট্ট ক্লাসঘরে একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীতে।

অতিরিক্ত তথ্য ও রেফারেন্সের জন্য দেখুন
http://bigyan.org.in/2015/03/25/gauss-and-train-math/

লেখাটি 'বিজ্ঞান'-এ মার্চ ২৫, ২০১৫ তারিখে প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রচ্ছদের ছবির উৎস :
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss

লেখা দিতে হলে

বৈদ্যুতিন লোকবিজ্ঞান (Popular Science) পত্রিকা বিজ্ঞান (http://bigyan.org.in)-এর বিভিন্ন বিভাগগুলিতে বিষয়ভিত্তিক লেখার জন্য আমরা সকলকেই আমন্ত্রণ জানাই।

বিজ্ঞান-এ লেখা পাঠানোর আগে লেখক অবশ্যই রচনার নিয়মাবলীটি পড়ে দেখুন।

আমরা যে ধরণের লেখা পেতে আগ্রহী

- বিজ্ঞানের (ব্যাপক অর্থে – গণিত ইত্যাদি সহ) কোন ধারণা বা concept-এর সহজ এবং অভিনব ব্যাখ্যা। যা সহজে পাঠ্য পুস্তকে পাওয়া যায় না অথবা অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তকে ভালভাবে বর্ণনা করা থাকে না। লেখকদের কাছে অনুরোধ আপনারা সাধারণ রচনাধর্মী লেখা পাঠাবেন না।
- কোন উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞানীর জীবনের কিছু ঘটনা, যা পড়ে তাঁর গবেষণা ও তার পরিপ্রেক্ষিত সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি। উইকিপিডিয়ার রচনামূলক ধাঁচের বদলে, কোন বিজ্ঞানীর বৈজ্ঞানিক অবদান এবং সেই আবিষ্কারের তাৎপর্যের উপর সংক্ষিপ্ত লেখাগুলো সাধারণত সুপাঠ্য ও আকর্ষণীয় হয়।
- কোন গবেষণার বিষয়ের বর্ণনা যা পাঠককে সেই বিষয়ে আরো জানতে অনুপ্রাণিত করবে। এক্ষেত্রে খুব বেশী টেকনিক্যাল টার্ম না ব্যবহার করা বিধেয়।
- নিজে কর – সহজে বাড়িতে বা স্কুলে তৈরী করা যেতে পারে বা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে এমন কোন বিষয়!
- বিজ্ঞানের কোন বিশেষ সমস্যা, যা বহুদিন ধরে বিজ্ঞানীদের ভাবাচ্ছে/ভাবিয়েছে তার বর্ণনা।
- বিজ্ঞানের খবর বা বিজ্ঞানের কোন বিষয় যা বর্তমানে বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক, যেমন জলবায়ুর পরিবর্তন ইত্যাদি। এইধরণের বিষয়ে নতুন কোন আবিষ্কার বা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদি কাম্য। কেবল মাত্র সমস্যার সাধারণ বর্ণনা যা উইকিপিডিয়ায় পাওয়া যাবে তা নয়।
- বিজ্ঞান বা অঙ্কের মজার ধাঁধা।

কিছু নিয়মকানুন

- লেখাটি বিজ্ঞানভিত্তিক হতে হবে। মেটাফিজিক্স জাতীয় লেখা পেতে আগ্রহী নই আমরা।
- লেখাটিকে এক হাজার শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখুন। তবে লেখার বিষয়বস্তুর উপযুক্ত ব্যাখ্যার প্রয়োজনে এর থেকে বড় লেখা লিখতে হলে সম্পাদকদের সাথে লেখা জমা দেওয়ার আগে আলোচনা করে নিন (bigyan.org.in-at-gmail-dot-com)।
- রাজনৈতিক বা কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে সমালোচনামূলক লেখা দয়া করে পাঠাবেন না।
- সম্পাদক মণ্ডলীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবাচিত হবে।
- লেখাতে যথাসম্ভব বৈজ্ঞানিক তথ্যের উৎস উল্লেখ করার অনুরোধ জানাচ্ছি। এছাড়াও লেখার শেষে প্রাসঙ্গিক কিছু লেখা বা ভিডিও-র লিঙ্ক দিলে কৌতূহলী পাঠকের উপকারে আসবে।

লেখার খুঁটিনাটি

- প্রতিটি লেখা বাংলা হরফে (Unicode) Google doc ফাইল হিসেবে ই-মেল-এ জুড়ে পাঠাতে হবে।
  ছবির ক্ষেত্রে best possible resolution-এ পাঠাতে হবে।
- ই-মেল-এ বিষয় এবং কোন বিভাগের জন্য লেখা পাঠাচ্ছেন তা উল্লেখ করুন। সেই সাথে আপনার সম্পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানান।
- ই-মেল করুন bigyan.org.in@gmail.com-এ।